প্রে-না-বি'র

অমনোনীত গল্প

মহেন্দ্র পুস্তক ভবন
২৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

করকমলেষু—

জগবন্ধুর মোহমুক্তি

আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের জগবন্ধুকে দেখিয়াছেন, না দেখিলেও তাহার নামটি অন্তত শুনিয়াছেন। আজ তাহার পূর্ণ বিবরণ শুনাইব। জগবন্ধু ধ্রুব-প্রহ্লাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ; তাই নিতান্ত বাল্যকাল হইতেই তাহার একটু আধ্যাত্মিক tendency ছিল। পূর্বজন্মের সংস্কারের ফলে সহজেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, জনপদে থাকিয়া অধ্যাত্ম-সাধনা সম্ভব নয়, সেজন্য বনে যাওয়া আবশ্যক।

কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সুবিধা মতো বন যে কোথায় আর সেখানে যাইবারই বা উপায় কি তাহা বুঝিয়া ওঠা সহজ নয়। নিকটেই অবশ্য সুন্দরবন, কিন্তু তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নস্বরূপ আছে রয়াল বেঙ্গল টাইগার। তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় তাহার সামান্য অংশ সত্য হইলেও তপস্যায় সিদ্ধি পর্যন্ত জীবিত থাকা সম্ভব না হইতেও পারে।

যাই হোক, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, অনেক টাইম-টেবিল ঘাঁটিয়া, সিংভূম জেলার একটি অরণ্য-অঞ্চলকে আপনার সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে সে বাছিয়া লইল। তারপরে একদিন সুপ্রভাতে

রেল গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। বলা বাহুল্য, সে টিকিট কিনিল না, কারণ একে বালক, তায় সন্ন্যাসী, এমন যাত্রীর নিকটে টিকিট চাহিবে কোন্ পাষাণ-হৃদয়!

তারপরে জগবন্ধু নিরাপদে উদ্দিষ্ট স্টেশনে আসিয়া নামিল এবং সন্ধ্যার পূর্বেই বনে গিয়া উপস্থিত হইল। স্থানটি দেখিয়া তাহার পছন্দ হইল। বন, তবে ঘন বন নয়। কাছেই আদি-বাসীদের পল্লী আছে, ভিক্ষার অভাব হইবে না। অদূরে পাহাড়, সেখানে রাখালে গরু চরায়, কাজেই তপস্যার অবসর সময়ে ডাংগুলি খেলিবার সাথীও পাওয়া যাইবে। দেখিয়া শুনিয়া পরদিন প্রাতঃকাল হইতে সে কঠোর তপস্যা সুরু করিয়া দিল। সে কৃচ্ছ্র-সাধনার কথা বলিয়া অযথা কালহরণ করিতে চাই না, শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তপস্যার নিষ্ঠার দ্বারা জগবন্ধু শ্রীমান ধ্রুবের রেকর্ড ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইল। নতুবা ধ্রুবকে যে ভগবান বারো বৎসর তপস্যা করিবার পরে দেখা দিয়াছিলেন, জগবন্ধুকে তিনি ছয় মাস পার না হইতেই দেখা দিবেন কেন?

একদিন সুপ্রভাতে স্বয়ং বিষ্ণু জগবন্ধুর কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগবন্ধু প্রথমটা তাঁহাকে কোন আদিবাসী যুবক মনে করিয়াছিল, পরে ভুল বুঝিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া বলিল—প্রভু, বসুন।

বিষ্ণু আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—বৎস, কি প্রার্থনা, বলো।

জগবন্ধু বলিল—আর কিছুই নয়, আমি সর্বপ্রকার মোহমুক্ত

হইতে চাই।

বিষ্ণু হাসিয়া বলিলেন—তাহার উপায় কি তপস্যা?

—তবে কি উপায়?

—অন্য উপায় আছে।

—ধ্রুব তো তপস্যাই করিয়াছিল।

—তখন যে সংবাদপত্র ছিল না!

—সংবাদপত্র! সংবাদপত্র কি-ভাবে মোহমুক্ত করিতে পারে?

—পড়িলেও করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু বেশী সময় লাগিবার কথা। কিন্তু সংবাদপত্রের বার্তা-বিভাগে চাকরি করিলে ছয় মাসের মধ্যে সর্বপ্রকার মোহমুক্তি অনিবার্য।

২

তারপরে বিষ্ণু বিস্মিত জগবন্ধুকে আদেশ দিলেন—বৎস, যাও, সংবাদপত্রের বার্তা-বিভাগে একটি চাকরি স্বীকার করো, ছয় মাসের মধ্যে সর্বপ্রকার মোহমুক্ত হইয়া তুমি অচিরকাল-মধ্যে মোহ মহাজলধির পরমহংসে পরিণত হইবে।

—কোন্ সংবাদপত্রে যাইব?

—যে কোনো একটায়, সবগুলি সমান। তবে শোনো—

এই বলিয়া তিনি জগবন্ধুর কানে কানে একখানি সংবাদ-পত্রের নাম বলিয়া দিলেন এবং বলিলেন—আর বিলম্ব করিও না, এখনি রওনা হও। আরও বলিলেন—আমার আশীর্বাদে সেখানে

যাইবামাত্র তোমার চাকুরী মিলিবে।

জগবন্ধু কয়েকদিন হইল 'বিশ্বম্ভর' সংবাদপত্রের বার্তা-বিভাগে চাকরি আরম্ভ করিয়াছে। সংবাদপত্রের পরিভাষায় এখন সে একজন 'সাব্'। সে দেখিল যে একটি নাতিবৃহৎ প্রকোষ্ঠে এইরূপ দশ বারোজন সাব্ বিড়ি টানিতে টানিতে 'কপি' তৈয়ার করিতেছে। মাঝখানে আসর জাঁকাইয়া নিউজ-এডিটার মহাশয় উপবিষ্ট। তিনি নবাগত সাব্ জগবন্ধুকে ডাকিয়া সাংবাদিকতার রহস্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন—তুমি নবাগত, এখানকার রীতিনীতি জানো না, শুনিয়া রাখো।

জগবন্ধু বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে বলুন, আমি শুনিতেছি।

—মন দিয়া শোনো। সত্য ও তথ্য শব্দ দুটি নিশ্চয় জানো। তথ্য সেই ঘটনা যাহা বাস্তবে ঘটে, আর সত্য সেই ঘটনা যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

—দুই কি এক নয়?

—কেমন করিয়া এক হইবে? তবে আর দুটি শব্দ হইল কেন? তথ্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যে রূপ লাভ করে, তাহাই সত্য।

—নির্বোধ জগবন্ধু প্রশ্ন করিল—দুয়ে প্রভেদ ঘটে কেন?

—ডিম্বে আর পক্ষীতে প্রভেদ হয় কেন? গুটিপোকায় আর প্রজাপতিতে প্রভেদ হয় কেন? ইহাই স্বভাবের নিয়ম—আর ঐ প্রভেদ ঘটানোতে সাংবাদিকের কৃতিত্ব।

—আজ্ঞা বুঝিলাম।

—তারপরে ধরো—শূন্যের কোন মূল্য নাই। তাহার যথেচ্ছ

কম-বেশী করা যাইতে পারে। যেমন ধরো, তোমার দলের কোন জনসভায় যদি ১০০ জন লোক উপস্থিত থাকে, তবে আরও কয়েকটা শূন্য যোগ করিয়া দিয়া তাহাকে ১০,০০০ হাজারে পরিণত করিবে। আর তোমার বিপক্ষের সভায় যদি ১০,০০০ হাজার লোক উপস্থিত হয়, তবে গোটাকয়েক শূন্য কমাইয়া দিয়া তাহাকে ১০০ এক শতে পরিণত করিবে। ইহারই নাম নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা।

এই বলিয়া তিনি বিড়িতে সজোরে টান দিলেন। আগুন প্রায় ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিল।

—গোঁফ কামাইয়াছি কেন জানো? ইহা সাংবাদিকতার কোন্ নীতির অন্তর্গত বুঝিতে না পারায় জগবন্ধু চুপ করিয়া রহিল।

নিউজ-এডিটার বলিলেন—নতুবা বিড়ির আগুনে গোঁফ পুড়িয়া যাইত। বুঝিলে? আচ্ছা এবারে নির্ভীক সাংবাদিকতা কাহাকে বলে শোনো। দুর্বল পক্ষের কুৎসা রটনা এবং প্রবল পক্ষের তোষামোদ করিবার নামই নির্ভীক সাংবাদিকতা। আর সত্যনিষ্ঠা যে কাহাকে বলে তাহা তো আগেই সত্য ও তথ্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এখন সত্যবাদিতা, নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা—ইহাই সংবাদপত্রের, অর্থাৎ আমাদের সংবাদপত্রের অর্থাৎ অন্য কোন সংবাদপত্রের নয়—মূল নীতি। ইহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মতো আমাদের সংবাদপত্রের শিরোদেশে বিরাজমান! বুঝিলে?

জগবন্ধু বলিল—আজ্ঞে, না বুঝিয়া উপায় কি! যেমন

সরস ও সরল ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন—ইহার মধ্যে না বুঝিবার আশঙ্কা কোথায় ?

জগবন্ধু নিজের আসনে আসিয়া বসিল, তাহার মাথা বিষম ঘুরিতে লাগিল। সত্য-মিথ্যা, নীতি-দুর্নীতি প্রভৃতি যে-সব ধারণা বাল্যকালে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে মানুষের মনে সংক্রামিত হইয়া যায়, সেগুলিতে প্রচণ্ড টান পড়িল। জগবন্ধু বলিল—ইহাই কি মোহমুক্তির পন্থা ? অথবা স্বয়ং ভগবান মিথ্যা কথাই বা বলিবেন কেন ? সরল জগবন্ধু জানিতে পারে নাই যে যাহা এইমাত্র সে শুনিল তাহা কলির সন্ধ্যামাত্র, নিশীথ রাত্রির অন্ধকার এখনো অদূর ভবিষ্যতে অপেক্ষমান।

জগবন্ধুর সব কেমন গোলমাল হইয়া যায়। যে-কলিকাতা শহরকে বাস্তবে দেখিতেছে তাহাকেই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দেখিয়া আর চিনিতে পারে না। পথে যদি দুটা কুকুরে ঝগড়া করে, কাগজে বাহির হয়—'দুই সহস্র শ্বাপদের কুরুক্ষেত্র কাণ্ড'; আবার কোথাও একটুখানি আগুন লাগিলে সংবাদে প্রকাশ হয়—'বৈশ্বানরের তাণ্ডবলীলা'। কিম্বা যে-পার্কের বর্গফল—১॥০ কাঠা জমি, তাহার উপরে অনায়াসে পঞ্চাশ সহস্র নাগরিকের সভা অনুষ্ঠিত হইয়া "অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডের" সত্যতা প্রতিপাদান করে। ফলকথা, প্রতিদিন বিপক্ষের তাল তিল হইতেছে এবং স্বপক্ষের তিল তাল হইতেছে, বেচারা 'তথ্য' 'সত্যের' মুখোস পরিয়া আসর মাৎ করিয়া দিতেছে।

একদিন জগবন্ধু এক সতীর্থ সাব্‌কে শুধাইল—মশাই, এ কি ব্যাপার ?

সে বলিল— ও-রূপ না লিখিলে চাকরি থাকিবে না, তাই লিখি।

—কিন্তু সত্য যে অন্যরূপ।

—আমরা একমাত্র সত্যকে চিনি। সে নিউজ-এডিটারের পুত্রের মাতুল।

—আচ্ছা কাল 'রসাতল' সংবাদপত্র সম্বন্ধে অতবড় একটা মিথ্যা লিখিলেন, তাহারা কি মনে করিবে!

—মনে করিবে নুনের গুণ গাহিতেছি। আবার 'রসাতল' কাগজে চাকরি লইয়া গেলে 'বিশ্বম্ভর' কাগজের ভুঁড়ি ফাঁসাইয়া দিব।

—কিন্তু লোকে কি মনে করিবে?

—নিন, সব গেল, এখন লোকের কথা তুলিলেন! হ্যাঁ, দেশে লোক কোথায় মশাই ?

—ওরা তবে কি?

—সব নাবালোক।

—সাবালোক নেই?

—সাবালোক ঐ একটি মাত্র—নিউজ-এডিটার! আর তার বাবালোক হইতেছে যাহাদের হাতে ক্ষমতা এবং অর্থ, অর্থাৎ সরকার ও বিজ্ঞাপনদাতা।

—কিন্তু সরকারকেও তো ছাড়িয়া কথা বলেন না!

—অবশ্যই বলি না। তবে সবই আপোষে। কোন্‌দিন সরকারের বিরুদ্ধে কি লিখিতে হইবে সেক্রেটারিয়েট হইতে 'কপি' আসে।

—এরূপ ব্যবহারের অর্থ ?

—সরকার-বিরোধিতা না করিলে অর্থ আসে না।

—সরকারের কি লাভ ?

—দুই পক্ষ না হইলে আসর জমে না। তাহা ছাড়া আমরা মাথা বাঁচাইয়া লাঠি মারি। লোকে ভাবে খুব মারিল, কিন্তু আঘাত পড়িতেছে মাটির উপরে।

—তবে কি সরকার আপনাদের পক্ষে নয় ?

—না, না, না। আমাদের সত্যকার এবং একমাত্র বিপক্ষ 'রসাতল' কাগজ। তাছাড়া বাকি আর সবই মায়া !

এই পর্যন্ত বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল—'রসাতলের হাড় খাবো, মাস খাবো, তার চামড়া দিয়া ডুগডুগি বাজাইব, তবে না দেশের শত্রু নিপাত হইবে, তবে না দেশ স্বাধীন হইবে, যতদিন রসাতল প্রকাশিত হইতেছে, ততদিন দেশ তথাকথিত স্বাধীন মাত্র—তাহার অধিক নয়।

ডিমের মধ্যে শাবক যতই পূর্ণাঙ্গ হইয়া ওঠে, খোলার বন্ধন ততই শিথিল ও জীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে, অবশেষে একদিন মুক্তির মাহেন্দ্র-ক্ষণে খোলা বিদীর্ণ হইয়া শাবক আকাশে পাখা মেলিয়া মুক্তি পায়।

জগবন্ধুর মোহবেষ্টনরূপ ডিমের খোলাটি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বেশ জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে এবং ভিতরের মুক্তিকামী বিহঙ্গও প্রতিমুহূর্তে আসন্ন সুপ্রভাতের দণ্ডপল গণনা করিতেছে।

মোহধ্বান্তনাশী সূর্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই।

একদিন নিউজ-এডিটার ও একজন সিনিয়র সাবে্‌র মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

নিউজ-এডিটার বলিল—রসাতলকে তো আর পারা যায় না—মিথ্যার বেসাতি করে এগিয়ে যাচ্ছে।

সিনিয়র সাব বলিল—বিপাকে ফেলুন।

—উপায় কি ?

—মোটর-চাপা দিন—অর্থাৎ তার মোটর কাউকে চাপা দিয়েছে লিখুন।

—সে কি ক'রে সম্ভব ? মোটর-চাপা পড়া ব্যক্তির নাম-ধাম চাই যে! মিথ্যা কথা তো আর লিখিতে পারি না!

—তবে নামধামওয়ালা সত্য ব্যক্তিকেই চাপা দিন।

—কোথায় পাবো ?

তারপরে নিউজ-এডিটর বলিলেন—এক কাজ করলে হয়। আমাদের নূতন সাবে্‌র নাম-ধাম ব্যবহার করা যাক না কেন!

—যদি আপত্তি করে!

—তবে চাকরি খেয়ে দেবার ভয় দেখাবো।

—চমৎকার!

পরদিন বিশ্বম্ভর পত্রিকায় একটি 'সত্য' বাহির হইল, বাহির হইল যে জগবন্ধু সরকার 'রসাতল' সম্পাদকের মোটর চাপা পড়িয়া নিহত হইয়াছে। তারপর সুদীর্ঘ 'কলম'-ব্যাপী 'রসাতল' সম্পাদকের নিন্দা বাহির হইল।

জগবন্ধু সংবাদ পড়িয়া স্তম্ভিত! 'সত্য' কি এতই 'সত্য'

হইতে হয়!

নিউজ-এডিটার জগবন্ধুকে ডাকিয়া বলিল---তোমার ক্ষতি কি? তুমি তো আর সত্যই মরো নাই! মাঝ থেকে আমরা একটু পলিটিক্স করলাম! তারপরে তিনি তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন—দেখো বাপু, আপত্তি ক'রো না বা প্রতিবাদ ক'রো না, তাহলে চাকরি থাকবে না।

জগবন্ধু বলিল---যে আজ্ঞে।

কিন্তু বিপদ হইল এই যে কেহই এখন আর বিশ্বাস করে না যে জগবন্ধু জীবিত আছে। সকলেই একবাক্যে বলে—আরে খবরের কাগজে তো আর মিথ্যা বাহির হইতে পারে না। ফলে দাঁড়াইল এই যে জগবন্ধুর চাকরি থাকিলেও সংসারে থাকা আর তাহার সম্ভব হইল না। সে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এইবারে তাহার মোহমুক্তি চূড়ান্তে পৌঁছিল। এখন সে নূতন মেহের আলির মতো 'সব ঝুটা হ্যায়' 'সব ঝুটা হ্যায়' রব করিতে করিতে সিংভূমের সেই অরণ্যে প্রস্থান করিল।

এবারে বিনা আহ্বানেই বিষ্ণু আসিয়া তাহাকে দেখা দিলেন, বলিলেন—বৎস, দেখো, তোমার অভীষ্ট লাভ হইল কিনা! তপস্যায় বসিলে অনেক দীর্ঘ সময় লাগিত!

জগবন্ধু শুধাইল—এখন আমি কি করিব?

বিষ্ণু বলিলেন—এখানকার শ্যামল প্রান্তরে ঘাসের অভাব নাই—চরিয়া খাও।

এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। জগবন্ধু গালে হাত

দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—একটা আস্ত মানুষের পক্ষে কিভাবে ঘাস খাওয়া সম্ভব!

হায় মূঢ় জগবন্ধু! ঘাস খাইতে যে শেখে নাই সে কি মানুষ!

নহুষের অতৃপ্তি

চিত্রগুপ্ত বলিল—প্রভু বড় সঙ্কটে পড়িয়াছি।

ব্রহ্মা বলিলেন—তুমি নিরন্তর সঙ্কটে পড়িতেছ, আর আমি উদ্ধার করিতেছি! আবার কি হইল?

—একটি লোক আসিয়াছে, তাহাকে কোন্ মহলে রাখা হইবে স্থির করিতে পারিতেছি না।

—কেন? লেজারে তাহার হিসাবটা দেখিয়া লও না!

—সেটা দেখিয়াই তো সঙ্কট বাধিয়াছে।

—জমা নাই?

—প্রচুর।

—তবে?

—আইনে মিলিতেছে না।

—কি রকম?

—লোকের পাপ-পুণ্যের জমা-খরচে জমার দিকে ইষ্টনাম,

হরিনাম, রামনাম বা ঐ-রকম কিছু জমা থাকে এখানে আসিয়া জমা-খরচের খতিয়ান করিয়া নির্দিষ্ট স তাহাদের স্থান দেওয়া হয়।

—ইহার হিসাবে কি জমা আছে?

—কোন দেবতার নাম বলিয়া মনে হয় না।

—তীর্থের নাম কি?

—আমাদের তীর্থের ক্যাটালগে তো দেখি না।

—পড়িয়া বুঝিতে পার না?

—অবশ্যই পারি। লোকটার নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অসীম, কারণ ঐ নাম ৮২ কোটি বার জমা আছে। কিন্তু নামটার অর্থ কি, ভালো না মন্দ, তীর্থ না দেবতা কিছুই র করিতে পারিতেছি না।

—একবার পড়ো দেখি, আমি শুনি।

চিত্রগুপ্ত চশমা আঁটিয়া লইয়া পড়িল—মন্নু সিং, স পরা, মোং ভবানীপুর। জমা ৮২ কোটি বার।

অসহিষ্ণু ব্রহ্মা বলিলেন—৮২ কোটি বার তো লাম, শব্দটা কি?

—'হাওড়া-শেয়ালদ'!

—'হাওড়া-শেয়ালদ'? তাইতো এ যে অবোধ্য। লিখিবার ভুল নয়তো!

—আমার স্বহস্তে লিখিত।

—সেই জন্যই তো সন্দেহ হইতেছে। আচ্ছা, লোকটার পেশা কি ছিল?

—এক রকম যন্ত্রযানের চালক বা ঐ জাতীয় আর কিছু ছিল।

—লেখাপড়া জানে ?

—বিশেষ নয়।

—তবে যে-কোন মহলে স্থান করিয়া দাও না।

—তা হইবার নয়। লোকটার সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা হইয়া গিয়াছে। সে বলে যাহাদের ইষ্টনামের জমার অঙ্ক অনেক কম তাহারা শ্বেতপাথরের মহলে স্থান পাইল, তাহার তো বৈকুণ্ঠের সুবার্বে স্থান পাওয়া দরকার।

—'হাওড়া-শেয়ালদ' কি তাহার ইষ্টনাম! এ কি রকম ইষ্টনাম? আচ্ছা লোকটাকে ডাকো, আমি একবার জেরা করিয়া দেখি।

মন্নু সিং, পরনে ময়লা হাফ-প্যাণ্ট, গায়ে হাতকাটা সার্ট, স্কন্ধে বিলম্বিত বাস-কণ্ডাক্‌টারের চামড়ার থলি, আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্রহ্মা শুধাইলেন—তোমার নাম কি ?

মন্নু সিং বলিল—ঐ খাতায় লেখা আছে, দেখে নিন্‌ না।

—তুমি তো বেশ বাংলা বলো দেখিতেছি !

—বলিব না ! এ যে কত সাধের মাতৃভাষা। (মন্নু সিং-এর উচ্চারণে শ, ষ, স = S)

—তুমি বাঙালী, তবে মোকাম ছাপরা লিখিয়াছ কেন ?

—নহিলে বাসে চাকরি মিলিবে কেন ?

—বাধা কি ?

—বুড়া হইয়া গেলেন তবু জানেন না? বাস্‌-ব্যবসা অবাঙালীর হাতে, তাহারা বাঙালীকে চাকরি দিবে কেন ?

—ক্ষতি কি ?

—অনেক ক্ষতি। ও-বিষয়ে বেশী আলোচনা করিলে শেষে প্রাদেশিকতার অপবাদে পড়িতে হইবে। ও থাক্ !

—এই বলিয়া কান হইতে একটি বিড়ি নামাইয়া ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে বলিল—শ্লাই আছে স্যর ? নাই ! আচ্ছা থাক্।

—'হাওড়া-শেয়ালদ' কি তোমার ইষ্টমন্ত্র ?

—ইষ্টমন্ত্র আবার কাকে বলে ? ভোরবেলা কাকপাখী ডাকিবার আগে সুরু করিতাম, শেষ হইত রাত্রি এগারটায়। তাছাড়া স্বপ্নেও মাঝে মাঝে ঐ নাম ফুকারিয়া উঠিতাম। কোন্ শালা সাধু এর চেয়ে বেশী জপ করে ?

—কিন্তু ওটা তো ঠাকুর-দেবতার নাম নয়, এমন কি তীর্থক্ষেত্রেরও নাম নয়।

মন্নু সিং আঙুলে তুড়ি মারিয়া বলিল—সোনার চাঁদ আর কি ! তোমার বাপ যে গীতায় রায় দিয়া রাখিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।" তুমি ওল্টাবার কে ? ভাবিয়াছিলে গীতা পড়ি নাই ? গীতা পড়িয়াই তো অল্প বয়সে বৈরাগ্য হইল, স্কুল ছাড়িয়া বাসের কণ্ডাক্টার হইলাম ! তাছাড় ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, তার উপরে আবার মেকানিকের কাজও জানি ! 'হাওড়া-শেয়ালদ' নামে আমি ভজনা করিয়াছি, এখন আমার পুণ্যের হিসাব হইতে সিকি পয়সা কমাও তো দেখি কেমন সাহস ! অমনি মৌলিক অধিকারের মামলা এব নম্বর ঠুকিয়া দেব না !

ব্রহ্মা বলিলেন—আচ্ছা, তুমি এখন যাও, তোমার প্রতি

অবিচার হইবে না।

মন্নু সিং প্রস্থান করিল।

ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তকে বলিলেন একবার উর্বশীর কাছে যাও না, কোন রকমে ভুলাইয়া রাজি করুক।

চিত্রগুপ্ত তখনি উর্বশীর নিকটে রওনা হইল।

সন্ধ্যাবেলা স্বয়ং উর্বশী ব্রহ্মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বলিল,—পিতামহ, লোকটা বড় সুবিধার নয়।

—কেন?

—কি বলে তার স্থির নাই!

—কেমন?

প্রথমে তার কাছে যাইতেই বলিয়া উঠিল, 'লেডিজ সীট' নাই, দাঁড়াইয়া যাইতে হইবে। বলিলাম—তাই যাইব। তারপরে বলে কিনা 'হাওড়া-শেয়ালদ' ছ' পয়সা, মৌলালি ন' পয়সা, বালিগঞ্জ তিন আনা। ইহার অর্থ কি বুঝিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতেছি, তখন বলিয়া উঠিল—মাইরি, রূপ দেখাইয়া বিনা পয়সায় যাইবে ভাবিও না। বড় বড় সিনেমা স্টারের কাছে ভাড়া আদায় করিয়া ছাড়িয়াছি! তুমি তো তুমি! সিনেমায় গেলে এখন বুড়ী ঝির ভূমিকা ছাড়া আর কিছু পাইবে না। পিতামহ, তাহার এই সব কথা শুনিয়া লজ্জায় ধিক্কারে চলিয়া আসিলাম।

—বেশ করিয়াছ। এখন স্বস্থানে যাও।

উর্বশী চলিয়া গেলে ব্রহ্মা বলিলেন—এখন উপায়?

চিত্রগুপ্ত বলিল—আমিও তো তাই ভাবিতেছি।

আর একবার মন্নু সিং-এর ডাক পড়িল।

ব্রহ্মা বলিলেন—ওহে ছোকরা, এক কাজ করো না।

—কি বলুন, যদি বিবেকে না বাধে তবে করিব।

—তুমি পৃথিবীতে ফিরিয়া যাও, তোমাকে রাজা করিয়া দিতেছি।

—ইয়ার্কি নাকি ? পৃথিবীতে গিয়া রাজা হই, আর সকলে রিভল্যুশন বাধাইয়া দিক্। ও রকম ক'গণ্ডা রিভল্যুশন আমি নিজেই করিয়া আসিয়াছি।

—তবে অনেক টাকাকড়ি নাও, পৃথিবীতে গিয়া একটা ব্যবসা করো।

—আর সকলে মিলিয়া ধর্মঘট বাধাক। চাঁদ আর কি স্বর্গে তোফা বসিয়া থাকেন, পৃথিবীর ঝঞ্ঝাটের খবর তো রাখেন না ?

—তবে চাও কি হে ছোকরা ?

ব্রহ্মা এবারে একটু রাগিয়াছেন।

—রাগবেন না মশাই। আপনার খাই না পরি ?

—খাওনা, পরোনা, তবে আমার কাছে আসিয়াছ কেন ?

—বোনাস্ আদায় করিতে।

—বোনাস্! সেটা কি ? আমি তো বোনাই পর্যন্ত জানি।

—আবার রসিকতাটুকুও আছে। পৃথিবীতে পুণ্য করিয়াছি, স্বর্গে তাহার সুফল পাইব—এই তো বোনাস্।

তোমার মাথা আর মুণ্ড !

—ও একই কথা। যাক্ দেবেন কিনা বলুন, না হয়, পৃথিবীতে গিয়া সকলকে বলিয়া দিই যে স্বর্গ দেউলে হইয়া গিয়াছে। তখন কেউ আর ভুলিয়াও আপনাদের নাম করিবে না, মজাটি বুঝিতে পারিবেন।

—ছেলেটা ভারি জ্যেঠা তো। আচ্ছা এখন যাও, আমি একটু ভাবিয়া দেখি।

—যা করিবার শীঘ্র করুন, নতুবা হয়তো এখানে একটা ধর্মঘট বাধাইয়া দিব—

বলিয়া মন্নু সিং সদর্পে প্রস্থান করিল।

ব্রহ্মার আহ্বানে দেবতাদের কার্য-নির্বাহক সমিতির জরুরী অধিবেশন বসিয়াছে। কর্ম-তালিকার একমাত্র বিবেচ্য বিষয় মন্নু সিং সম্বন্ধে ইতি-কর্তব্য।

দেবতাদের ও মানুষের সভার কার্যক্রমে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। প্রায় তিন প্রহর আলাপ-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে মন্নু সিংকে জিজ্ঞাসা করা যাক সে কি চায়?

সমিতির আহ্বানে মন্নু সিং আসিল। সে বলিল—দু'টি ছিলেন, এখন সাতটি হইয়াছেন, এক-একজনের আবার এক-এক মূর্তি! বলি এত ডাকাডাকি কেন?

—তুমি চাও কি?

—এখানে দিব্যি সুখে-শান্তিতে থাকিতে চাই, যেমন আপনারা আছেন।

—দেখিতে পাইতেছ তো স্থানাভাব!

—নূতন বাড়ী তৈয়ারী করুন, খালি জমি তো অনেক পড়িয়া আছে।

—অর্থাভাব।

—বটে! এই যে এখনি অনেক টাকা দিতে চাহিলেন, সে-সব বুঝি সব ধাপ্পা? মশাই, জানিয়া রাখুন, মন্নুকে ধাপ্পা দিতে পারিবেন না, অনেক মালিক ঘায়েল করিয়া এখানে আসিয়াছি। স্বর্গের রেজিষ্টারে দেখিয়া লইয়াছি, চৌষট্টি লক্ষ বৎসর আমার স্বর্গবাস।

—আচ্ছা কি হইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?

সে অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—স্বর্গে আমি একটা 'বাস সার্ভিস্' খুলিতে চাই। তার ব্যবস্থা করিয়া দিন, আপনাদের আর বিরক্ত করিব না। তাছাড়া এই কমিটির মেম্বারদের ফ্রি পাশ দেবো।

স্বর্গে 'বাস সার্ভিস্'! দেবতারা স্তব্ধ হইলেন। কিন্তু কিছু করিতেই হইবে, মন্নু সিং নিজের 'রাইট' সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন।

ব্রহ্মা কিছু রাগতভাবেই বলিলেন—তুমি বড়ই অবাধ্য। শুধু তাই নয়, নিজের হিতাহিত বুঝিতে অক্ষম। স্বর্গের যাবতীয় সুখ তোমার কাছে কিছু নয়, তুমি পৃথিবীর মতো বাস্ চালাইতে চাও। তবে এখানে আসিলে কেন?

মন্নু সিং বলিল—বেশ মশাই, আমি কি ইচ্ছা-সুখে আসিয়াছি?

—তা যেন বুঝিলাম, কিন্তু বাস্ চালানো এমন কি সুখের?

—তা আপনারা বুঝিবেন কি? যার যেমন অভ্যাস।

—কাজটা অত্যন্ত ক্লেশজনক বলিয়াই তো মনে হয়।

দূর হইতে অমনি মনে হইয়া থাকে। স্বর্গের দেবতারা নিষ্কর্মা বসিয়া আছেন—ওটাকেও আমার ক্লেশজনক মনে হইতেছে। বাস্ চালাইতেছি, 'হাওড়া-শেয়ালদ' হাঁকিতেছি, লোক উঠিতেছে, নামিতেছে, ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী কেহ হাসে, কেহ গম্ভীর হইয়া থাকে, কেহ বক্‌বক্ করে ; আবার মাঝে মাঝে যাত্রীদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া যায় ; পয়সা দেয়, টিকিট দিই ; কেহ কেহ ফাঁকি দিতে চায়, ধরিয়া ফেলি ; আবার মাঝে মাঝে কেহ নামিতে গিয়া পড়িয়া মরে, হাত-পা ভাঙিয়া ফেলে—সে এব সম্পূর্ণ অন্য জগৎ ! আমি সেই জগতের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—মানে ভগবান ! এর যে কি আনন্দ তা অপরে কি বুঝিবে ?

—কিন্তু এখানে বাস্ পাই কোথায় ?

—কেন ? ঐ যে নদীর ধারে একখানা বাস পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলাম !

চিত্রগুপ্ত বলিল—সত্যই ওখানে একখানা যন্ত্রযান পড়িয়া আছে বটে।

ব্রহ্মা শুধাইলেন—আসিল কি প্রকারে ?

—ঐ বাসে একটা চোর চাপা পড়িয়াছিল। সেটি পুণ্যকর্ম তাই সেখানাকে ধ্বংসের পরে স্বর্গে আনা হইয়াছে।

--কিন্তু ওখানা কি চলিবে ?

মন্নু সিং বলিল—আমি মেরামত করিয়া লইব।

—চালক পাইবে কোথায় ?

—জোগাড় করিয়া লইব।

ব্রহ্মা রাগিয়া বলিলেন—তবে তাই করো—আর খাটিয়া মরো।

মন্নু সিং সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আনন্দে প্রস্থান করিল।

মন্নু সিং অসাধ্য সাধন করিতে পারে। স্বর্গতদের মধ্য হইতে খুঁজিয়া-পাতিয়া একজন ড্রাইভারকে আবিষ্কার করিল, তারপরে সেই ভগ্নপ্রায় বাসখানাকে দুই জনে মিলিয়া চালু অবস্থায় আনিল। তখন তাহাদের আনন্দ দেখে কে? ড্রাইভার চন্দন সিং স্টিয়ারিং-এ বসিল, আর মন্নু সিং বাসের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া অভ্যস্ত উচ্চকণ্ঠে হাঁকিতে লাগিল—'হাওড়া-শেয়ালদ' ছে পয়সা!

বুদ্ধিমান পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে হাওড়া ও শিয়ালদ স্বর্গের এলাকাভুক্ত নয়, কিন্তু পুরাতন অভ্যাস তো সহজে যাইবার নয়!

মন্নু সিং-এর বাস্-সার্ভিস ইন্দ্রলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত চলিতেছে, কাজেই ইন্দ্রলোক হাওড়া, আর ব্রহ্মলোক শিয়ালদ। দেবতারা আপত্তি করিলে মন্নু সিং বলিত—এই নামেই চলিবে, আপনাদের ইচ্ছা না হয় চাপিবেন না।

কিন্তু দেবতারা বাসে চাপিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে বড় কেহ ঘেঁষিত না, শেষে একে একে সকলেই 'ছে পয়সা' ভাড়া দিয়া বাসে চড়িয়া পার্থিব আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েরাও বাসে চড়িতে লাগিল।

মন্নু সিং কয়েকখানা আসনের গায়ে লিখিয়া দিল—

'মহিলাদের জন্য'। একজন ছোকরা দেবতা বলিল-- ও আবার কেন? সকলে একত্র বসিব, ওটা দেবতাদের মৌলিক অধিকার। মন্নু সিং বলিল—ও মৌলিক অধিকার বাড়ীতে খাটাইবেন, বাসে মহিলা ও পুরুষের স্বতন্ত্র আসন।

মন্নু সিং-এর কথা না মানিয়া উপায় নাই—স্বর্গে একখানি মাত্র বাস। কিন্তু মহিলা আসনের কাছেই ভিড়টা কিছু বেশি হইত।

শেষে মন্নু সিং-এর বাসের খ্যাতি এমন রটিয়া গেল যে একদিন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া বাসে চাপিলেন। মন্নু সিং সসম্ভ্রমে তাঁহাকে একটি আধা-সেলাম করিয়া তাঁহার দিকে একখানি টিকিট আগাইয়া দিয়া বলিল—'ছে পয়সা।'

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মন্নু সিং-এর অবস্থা এখন বেশ ভালো, উপার্জনের অন্ত নাই, নিতান্তই অভ্যাস-দোষে গাড়ী চালায়, নতুবা প্রয়োজন তাহার ছিল না। কিন্তু মনে তাহার তৃপ্তি নাই, কেমন যেন এক অতৃপ্তি বোধ করে। মাঝে মাঝে তাহার কলিকাতা শহর মনে পড়িয়া যায়, শেয়ালদ, হাওড়া, হার্সন রোড, সেই জনতা, ঠেলাঠেলি, সেই হাজার রকম মিশ্র কোলাহল, অমনি তাহার মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়, (টিকিটের দাম লইতে ভুলিয়া যায়) স্বর্গকে অলীক বলিয়া বোধ হয়; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে—আহা, একবার যদি ফিরিয়া যাইতে পারিতাম; চোখ ছলছল করিয়া ওঠে। কিন্তু তখনি বুঝিতে পারে—তাহা হইবার নয়। তখনি আবার (টিকিটে মন দেয়) হাঁকিয়া ওঠে 'হাওড়া-শেয়ালদ' ছে পয়সা।

ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র

—বলি কিছু বুঝলে খুড়ো ?

—এতদিন ওদের চারপাশে ঘুরছি, ওদের কত ভাবেই না আত্মসাৎ করেছি, আর বুঝবো না ?

—আমারও সেই কথা। তবে কিনা একটা শব্দে কেমন বাধো বাধো ঠেকছে।

—কি বলো দেখি ?

—ঐ যে বারবার বলল, 'ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র'—ওটার অর্থ কি ?

—যা বলেছো, ওটা আমিও বুঝতে পারি নি।

—কিন্তু ওটা না বুঝ্‌লে তো কিছুই বোঝা হ'ল না—বক্তৃতাটা সমস্তই ঐ শব্দটির ব্যাখ্যা।

—তাও তো বটে।

—চলোঃ না একবার কর্তামশায়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, হয়তো একটা কিনারা করতে পারবেন।

—সে মন্দ বলো নি, চলো।

তখন তারা দুইজনে কর্তামশায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তখন একটি গুবাক্-কুঞ্জে বসিয়া একটি ছাগমুণ্ড চর্বণ করিয়া সান্ধ্য-জলযোগ সমাধা করিতেছিলেন।

এবারে বোধ হয় পাঠকে লেখককে উন্মাদ ভাবিতে আরম্ভ

করিয়াছেন, কারণ কর্তামশায়ের কর্তৃত্ব যতই বিপুল হোক না কেন তিনি ছাগমুণ্ড চর্বণ করিয়া জলযোগ সমাধা করিবেন এ কি রকম কাণ্ড !

কিন্তু এরকম কাণ্ড যে শুধু ঘটে তাহা নয়, না-ঘটাই বিস্ময়কর। কারণ লেখক কয়েকটি বাঘের কাহিনী বলিতে বসিয়াছে।

পূর্বোক্ত কথোপকথনকারীদ্বয় দুটি ব্যাঘ্র, নাম বিপুলক্ষুধা ও বহুক্ষুধা ; আর কর্তামশায় স্বয়ং দক্ষিণ রায়, ব্যাঘ্র সম্প্রদায়ের রাজা ; আর ঘটনাস্থল সুন্দরবন।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে বিপুলক্ষুধা ও বহুক্ষুধা বিষয়-কার্য ব্যপদেশে জয়নগরের দিকে গিয়াছিল। সেখানে একটি বিরাট জনসমাবেশ দেখিতে পাইয়া তাহারা সন্তর্পণে একটি ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করিল। সেইভাবে অবস্থান করিয়া তাহারা শুনিল যে একজন লোক উচ্চস্বরে বক্তৃতা করিতেছে। বক্তৃতার বিষয় ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বরূপ। ব্যাঘ্রদ্বয় অনেক মনুষ্য আত্মসাৎ করিয়াছে, তাই মানবের ভাষা তাহাদের অপরিচিত নয়—ঠেকিল ঐ 'ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র' শব্দটায়। ঐ শব্দটা তাহারা আগে কখনো শোনে নাই। এবারে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে লেখক একটিও অসম্ভব কথা বলে নাই, বরঞ্চ ইহার বিপরীত ঘটিলেই অসম্ভব মনে হইত।

দক্ষিণ রায় তাহাদের সমস্যা শুনিয়া বলিল—এ তো অতি সহজ। ধর্ম নিরপেক্ষ মানে যাহারা ধর্মের ধার ধারে না। যেমন ধরো এই আমরা। আমরা শিকার করিবার সময়ে কি

শিকৃত প্রাণীর ধর্মের সন্ধান করি? করি না। হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান-বৌদ্ধ সবই খাইয়া থাকি। কিন্তু আবার দেখো, কংগ্রেসী, কম্যুনিষ্ট, সোশালিষ্ট, হিন্দু মহাসভা কোন দলের লোকের প্রতিই আমাদের অরুচি নাই। ইহারই নাম ধর্ম নিরপেক্ষতা—বুঝিলে?

বিপুলক্ষুধা ও বহুক্ষুধা কর্তার ব্যাখ্যাকে একটা উচ্চাঙ্গের রসিকতা মনে করিয়া হাউ হাউ শব্দে হাসিয়া উঠিল।

কর্তা বলিলেন—কেন বিশ্বাস হ'ল না?

একজন বলিল—কেমন ক'রে হয়, স্যার?

—মানুষ তবে কি মানুষ খাবে?

কর্তা বলিলেন—তোমরা বাঘ তাই খাওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পারো না। ধর্ম নিরপেক্ষভাবে কেবল আহার করাই যায় না, রাষ্ট্র পরিচালনা করাও সম্ভব। মানুষ বক্তাটি বোধ হয় সেই কথাই বলিতেছিল।

বহুক্ষুধা শুধাইল—রাষ্ট্র পরিচালনায় তবে কি বিপরীত পন্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে?

—অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করছ যে ধর্ম নিরপেক্ষতা ছাড়াও রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব কিনা?

ব্যাঘ্র দুটি মুখ নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

কর্তা বলিলেন—এই নদীর ঐ পারে আর এক রাজ্য, সেখানে একবার ঘুরিয়া এসো।

নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আশায় তাহারা সম্মত হইল।

কর্তা বলিলেন—ওখানে একটু সাবধানে থাকিও, ওখানকার হালচাল স্বতন্ত্র। সাবধানে থাকিবে প্রতিশ্রুতি দিয়া নদীর

পরপারে যাত্রার উদ্যোগ করিবার জন্য তাহারা বিদায় লইল।

কয়েকদিন পর বহুক্ষুধা ও বিপুলক্ষুধা সুন্দরবনে দক্ষিণ রায়ের সমীপে ফিরিয়া আসিল।

কর্তা শুধাইলেন—তোমাদের কাহিল দেখিতেছি কেন?

তাহারা বলিল—আগে শুনুন, তখন জিজ্ঞাসা করিবেন।

—বেশ বলো।

—আমরা তো ওপারে গিয়ে গুটি গুটি চলেছি, মাঠের মাঝে কয়েকজন চাষী কাজ করছিল, তারা আমাদের দেখে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—শের, শের! আমরা ভাবলাম সের! সের কেন? আমাদের প্রত্যেকের ওজন অন্ততঃ পাঁচ ছ' মণ! তবে সের কেন? তাহাদের শুধালাম—আমাদের ওজন তো এক মণের অনেক বেশি!

আমাদের কথা শুনে তারা বল্‌ল—এখানে এক মণ বলে কিছু নেই। তাছাড়া ওপারের মণ এখানে শেরের বেশি নয়।

তখন আমরা বল্‌লাম—না-হয় আমরা সেরই হ'লাম, কিন্তু আমাদের দেখে কি তোমাদের ভয় হয় না? তারা বল্‌ল—ভয়! ভয় কেন হবে? আমাদের দেখেই সকলে ভীত।

আমরা শুধালাম—তোমাদের দেখে ভয় পাবে কেন? তোমাদের নখ নেই, দাঁত নেই।

তারা বল্‌ল—বটে! কিছুদিন থাকো, দেখতে পাবে!

এমন সময় উর্দি-পরিহিত একটা লোক এসে শুধালো—

তোমরা কোত্থেকে আসছ ?

—ওপার থেকে।

—ওপার থেকে ? তোমাদের ছাড়পত্র কই ?

শুনুন একবার কথা ! আমরা কত জন্তু-জানোয়ার-মানুষকে চিরকালের জন্য ছাড়পত্র দিই ! আমাদের কাছে কিনা ওরা ছাড়পত্র দেখতে চায়। আমরা বললাম—ছাড়পত্র নেই।

সে বল্‌ল—তবে কেমন ক'রে বুঝবো যে তোমরা ওপারের গুপ্তচর নও ?

—বাঘে কি গুপ্তচরগিরি করে ?

—তোমরা যে সত্যকার বাঘ তারই বা প্রমাণ কি ? খুব সম্ভব তোমরা ব্যাঘ্রচর্মাবৃত মানুষ।

—তা'হলে তুমিও খুব সম্ভব মানবচর্মাবৃত ব্যাঘ্র !

—বটে !

লোকটি এবার রেগে উঠল আর একটা বাঁশীর আওয়াজ করলো। সেই শব্দ শুনে একদল লোক এসে উপস্থিত। পূর্বোক্ত লোকটির হুকুমে তারা এসে আমাদের দুজনকে বেঁধে নিয়ে চল্‌লো।

কর্তা একটু হাসিয়া শুধাইলেন—তারপর ?

—তারপরে কতকগুলি লোক এসে আমাদের লেজ ও কান ধরে টানাটানি সুরু করলো।

—কেন ?

—আমরা বাঘের চামড়া প'রে ছদ্মবেশে এসেছি কিনা পরীক্ষা করবার জন্য।

—পরীক্ষার ফল কি হ'ল ?

—বোধ করি তারা আমাদের ব্যাঘ্রত্বে নিঃসন্দেহ হ'ল।

—তখন ?

তারা শুধালো—তোমরা ওপারের লোক, এখানে কেন ?

আমরা বল্‌লাম—এ রাজ্য ধর্ম নিরপেক্ষ কিনা তাই দেখবার জন্য এসেছি। তা শুনে বল্‌ল—ধর্মের কোন অপেক্ষা আমরা করি না। আর একজন বল্‌ল—ধর্মের কোন ধার আমরা ধারি না।

আমরা বল্‌লাম—সকলেরই একটা ধর্ম আছে, এমন কি আমরা যে বনবাসী আমাদেরও বন্যধর্ম বর্তমান, আর তোমাদের কোন ধর্ম নাই, এ কেমন কথা ?

তখন তারা বল্‌ল—ওঃ, আমাদের ধর্ম দেখতে চাও ? আচ্ছা দেখাচ্ছি। এই বলে' তারা সকলে বড় বড় লাঠি নিয়ে আমাদের তাড়া করলো। আমরা প্রাণপণে ছুটে গিয়ে নদীর জলে পড়লাম, আর কোন রকমে সাঁতরে এপারে এসে উঠেছি।

তারপরে তাহারা কিছুক্ষণ দম লইয়া বলিল—কর্তা মশাই, ওপারের ধর্ম বড় জব্বর, যেমন মোটা তেমনি পাকা, একেবারে হাতে হাতে ফল দেয়।

এবারে কর্তা অর্থাৎ দক্ষিণ রায় আরম্ভ করিলেন, বলিলেন—তবে আসল কথা শোন, এপার-ওপার কোন পারই ধর্ম নিরপেক্ষ নয়। ওপারের ধর্ম মোটা আর পাকা অর্থাৎ লাঠি, আর এপারের ধর্ম সূক্ষ্ম আর জ্বালাময় অর্থাৎ বক্তৃতা, অর্থাৎ একটা অ্যালোপ্যাথি মত, অপরটা হোমিওপ্যাথি মত, তবু দুই-ই ধর্ম।

তারপরে তিনি বলিলেন—আসল ধর্ম নিরপেক্ষ রাজ্য এই সুন্দরবন, আমার রাজত্ব। বিশ্বাস না হয় ঐ চেয়ে দেখো—

ব্যাঘ্রদ্বয় চাহিয়া দেখিল একটি ঝোপের পাশে একখানা ধুতি, একখানা লুঙ্গি এবং একটি পেণ্টুলুন পড়িয়া আছে, তিনখানাই রক্তাক্ত।

—কি ব্যাপার ?

—ব্যাপার আর কি ? কাল একটি হিন্দুকে, একটি মুসলমানকে, আর একটি খৃষ্টানকে আত্মসাৎ করেছি। তিনটিই বেশ সরেস, ধর্মভেদে মাংসের স্বাদে ভেদ নেই দেখলাম।

—তবে দেখছি আমরা দু' পায়ের চেয়েই মহত্তর।

—তা আর বলতে !

কিন্তু কর্তামশায়ের বাক্য শেষ করিবার অবকাশ হইল না, অদূরে মানবধর্মবিশিষ্ট কোন দ্বিপদকে দেখিয়া তিনি ধাবিত হইলেন, বিপুলক্ষুধা ও বহুক্ষুধাও তাঁহার অনুসরণ করিয়া পিছনে পিছনে ধাবিত হইল।

পক্ষিরাজ গাধা

এক আস্তাবলের কাছে এক গাধা থাকিত। ঘোড়ার আদর-যত্ন দেখিয়া সে বেচারা ঈর্ষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। সে ভাবিত, দেখো-দেখো, বিধাতার কি অবিচার, আমরা দু'জনেই চতুষ্পদ অথচ দুয়ের প্রতি মানুষের ব্যবহারে কি পার্থক্য। ঘোড়ার জন্য সহিস, কচি ঘাস, দানাপানি, তাও আবার ঘুরিয়া সংগ্রহ করিতে হয় না, ঘরে আসিয়া জোটে, আর আমাকে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া একমুঠা শুকনা ঘাস সংগ্রহ করিতে হয়। হায়! বিধাতার এইরূপ বৈষম্য কেন?

তখন গাধাটা ভাবিতে লাগিল, হায়, আমি যদি কোন রকমে ঘোড়া হইতে পারিতাম! তার পরে ভাবিল, না, ঘোড়া নয়, একেবারে যদি পক্ষিরাজ ঘোড়া হইতে পারিতাম, তবে ঘোড়াগুলা সত্যই জব্দ হইত। সে ভাবিল, ও-গুলা তো মাটিতে হাটে, আমি আকাশে উড়িয়া বেড়াইতাম, আর আমাকে দেখিয়া, আমি যেমন আজ হিংসায় জ্বলিতেছি, উহারাও হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত।

তারপর হইতে সে প্রতি মুহূর্তে কেবলি পক্ষিরাজ ঘোড়া হইবার কামনা করিতে লাগিল এবং সত্য-সত্যই একদিন পাখা গজাইয়া পক্ষিরাজে পরিণত হইল।

সেদিন সকালবেলায় সে জলাশয়ের ধারে জল পান করিতে গিয়াছিল, হঠাৎ নিজের ছায়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—পিঠে

ও-দুটা কি ? ডানা নাকি ? তবে কি তাহার প্রার্থনা পূরণ হইয়াছে নাকি ? আচ্ছা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি না কেন, এই বলিয়া সে উড়িবার চেষ্টা করিল। চেষ্টা করিবা-মাত্র সে আকাশে উড়িতে লাগিল—উঁচুতে উঁচুতে, ইস্ কত উঁচুতে! ঐ যে আস্তাবলটা খেলাঘরের মতো আর ঘোড়া-গুলাকে বিড়ালের মত দেখাইতেছে। সে ভাবিল, ঘোড়াগুলি কি তাহাকে দেখিতে পাইতেছে, দেখিতে পাইলে কি ভাবিতেছে! সে ভাবিল, আজ তাহাকে পায় কে! বাহা, বাহা, কি মজা!

এমন সময়ে একদল ছেলে তাহাকে ঐ অবস্থায় উড়িতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—দেখ্, দেখ্, একটা পক্ষীরাজ গাধা!

ছেলেরা তার পিছনে হাততালি দিতে দিতে 'পক্ষিরাজ গাধা' 'পক্ষিরাজ গাধা' চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল।

গাধাটা ভাবিল, ছেলেগুলা কি গাধা, ঘোড়ায়-গাধায় তফাৎ জানে না!

যাই হোক, অবশেষে তাহাকে মাটিতে নামিতে হইল। আকাশে খাদ্য-পানীয়ের অভাব।

মাটিতে নামিবামাত্র মহাসঙ্কট দেখা দিল। সকলে আসিয়া তাহার ডানা ধরিয়া টানাটানি করে, বলে—জাল ডানা নয় তো? বলে—গাধার ডানা গজাইল কিরূপে? তখন তাহার চারদিকে প্রকাণ্ড একটি মেলা জমিয়া গেল।

এদিকে বেচারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মর-মর, কিন্তু তাহা কে

বুঝিবে ? কেহ আসিয়া তাহার ছবি তোলে, কেহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপ গ্রহণ করে, আর সকলেই ডানা ধরিয়া একবার টানে ! এমন কি একজন চতুর সাংবাদিক তাহার কাছে একটি বাণী প্রার্থনা করিয়াও বসিল !

গাধাটা ভাবে—মানুষগুলি কি গাধা ? কখনো কি পক্ষিরাজ দেখে নাই !

পক্ষিরাজ গাধা দেখা দিয়াছে সংবাদ পাইয়া চিড়িয়াখানা ও জাদুঘরের কর্তৃপক্ষগণ দেখিতে আসিল। তাহারা পক্ষিরাজ গাধা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

একজন বলিল—যে কালের যেমন ধর্ম।

—তাতো বটেই। এ যেমন গুরুচণ্ডালী যুগ, তাতে পক্ষিরাজ গাধা ছাড়া আর কি সম্ভব ?

তখন উভয়ে তর্ক বাধিল—এটাকে কোথায় লওয়া যায়, চিড়িয়াখানায় না জাদুঘরে। অবশেষে অনেক বিতর্কের পরে স্থির হইল যে জাদুঘরে রাখিলে চিরকাল থাকিবে, কাজেই জাদুঘরে রাখাই সঙ্গত।

—কিন্তু সেখানে তো জীবিত প্রাণী রাখা সম্ভব হয় না।

—তবে মারিয়া ফেলো।

স্থির হইল যে পরদিন প্রাতে পক্ষিরাজ গাধাটাকে গুলি করিয়া মারা হইবে।

সে-রাত্রি গাধাটার আর ঘুম হইল না। বিধাতার কাছে প্রার্থনা করিয়া সারারাত্রি কাটাইল—দয়াময়, আমাকে পুনরায় গাধা করিয়া দাও, পক্ষিরাজ গাধা হইয়া আমি মরিতে চাই না,

তার চেয়ে আগের মতো পদাতিক গাধা হইয়া বোঝা বহিয়া বেড়াইব, সে অনেক ভালো।

ভোর রাত্রে সে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ভোর হইবামাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া পিঠ বেশ হাল্কা অনুভব করিল। তাড়াতাড়ি জলাশয়ের ধারে গিয়া ছায়া ফেলিয়া দেখিল—ডানা নাই।

তখন তাহার সে কি স্ফূর্তি! সে আর পক্ষিরাজ গাধা নয়—আগের মতো সাধারণ পদাতিক গাধা!

জাদুঘরের কর্তৃপক্ষ বন্দুক হাতে করিয়া আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল, বলিল—কাল নিশ্চয় চোখে ঝাপ্সা দেখিয়াছিলাম, গাধার আবার ডানা গজায়?

তখন গাধাটা নিশ্চিন্ত মনে মাঠে গিয়া ঘাস খাইতে সুরু করিল—আজ শুকনা ঘাস তাহার মুখে বেশ মিষ্ট লাগিল। তারপরে আর কখনো ভুলিয়াও সে ঘোড়া হইবার প্রার্থনা করে নাই—পক্ষিরাজ ঘোড়া তো দূরের কথা।

গল্পটির অন্তর্নিহিত নীতি এই যে গাধার ডানাই গজাক, ডিগ্রি লাভই হোক, সভাপতিত্বই জুটুক কিম্বা সম্পাদকত্ব বা অধ্যাপক-পদ যাহাই জুটুক না কেন, গাধা সর্বদাই গাধা—তাহার বেশী কিছুই নয়।

বাজীকরণ

একদিন প্রাতঃকালে একটি শিশু তাহার পিতার সহিত মাঠে বেড়াইতেছিল। সেই মাঠে একটি গাধা চরিতেছিল। শিশুটির বয়স তিন বছরের বেশী নয়। গাধাটিকে দেখিয়া সেই শিশুটি খুব কৌতূহল অনুভব করিল। বইয়ের পাতায় সে ঘোড়ার ছবি দেখিয়াছিল, সেই স্মৃতির প্রেরণায় সে বলিল—বাবা, ঐ যে ঘোড়া।

বাবা বলিল—না, ওটা গাধা। শিশুটি বলিল—না বাবা, ঘোড়া। পিতা যতই বলে—না, ওটা গাধা, শিশুর ততই জেদ চাপিয়া যায়, সে বলে—না বাবা, ঘোড়া।

শেষে তাহার পিতা বিরক্ত হইয়া বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা, ওটা ঘোড়াই বটে, হ'ল তো!

শিশুটি জয়লাভ করিয়া খুশী হইল এবং বলিতে লাগিল—ও ঘোড়া, ঘোড়া, একবার ডাকো তো?

শিশুটিকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সংসারে অনেক বয়স্ক লোকও গাধায়-ঘোড়ায় প্রভেদ করিতে পারে না, ও তো নিতান্ত শিশু!

পিতা ও পুত্রের কথোপকথন গাধাটির কানে প্রবেশ করিয়া তাহার জীবনে যে পরিবর্তন ঘটাইল তাহারই বিবরণ এই গল্প।

গাধাটি ভাবিল—তাই বলো, আমি তাহা হইলে গাধা নই, লোকে নিতান্ত হিংসায় আমাকে গাধা বলিয়া থাকে। ঐ

শিশুটির সরল মন, সংসারের হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা এখনো তাহার বুদ্ধিকে আবিল করে নাই, তাই সে আমার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছে। এতদিন আমার মনে যে সন্দেহ ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল—এখন হইতে আমি স্থির জানিলাম যে আমি গাধা নই, আমি ঘোড়া বা অশ্ব বা বাজী।

অতঃপর সে মাঠ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

ঘরে ফিরিবার পর হইতে গাধাটি যথাসম্ভব ঘোড়ার মতো আচরণ করিতে লাগিল। সেই আচরণে সে কতদূর সাফল্য লাভ করিল বর্ণনা করিবার আগে তাহার কিছু বিবরণ দেওয়া দরকার।

সহরে বৈজু নামে এক ধোপা ছিল। তাহার অনেকগুলি গাধা ছিল। উক্ত গাধাটি সেই রাসভ-বাহিনীর অন্যতম জীব। অন্যান্য গাধার মতো সে বৈজুর বস্ত্র-সম্ভার বহন করিত, আর অবসর সময়ে মাঠে চরিয়া ঘাস খাইত, কখনো কখনো বা বৈজুর কনিষ্ঠ পুত্র মোতিয়াকে পিঠে বহন করিত। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত কাজটা স্বেচ্ছায় করিত না, মোতিয়ার এবং তাহার মাতার তাড়নায় করিত ; তাহার প্রধান আনন্দ ও গৌরব ছিল বস্ত্রসম্ভার বহনে, কারণ এ কথা মানুষের বিদিত না থাকিলেও গর্দভ সমাজে সুবিদিত যে বস্ত্রস্তূপের ওজনেই গাধার কৌলিন্য নির্ধারিত হইয়া থাকে। উক্ত গাধাটির মতো এত কাপড় বহিতে আর কেহ পারিত না। কাজের সুবিধার জন্য এখন হইতে আমরা তাহাকে বৈজু ধোপার গাধা বলিয়া উল্লেখ করিব।

বৈজু ধোপার গাধা এখন আর পিঠে কাপড়ের বস্তা তুলিতে দিত না, কাপড় চাপাইতে আসিলে পিছনের পদদ্বয় দ্বারা আঘাত করিত এবং বলা বাহুল্য সেজন্য বংশখণ্ডের দ্বারা আঘাত-প্রাপ্ত হইত। কিন্তু তাহাতে সে দমিত না, কারণ একটা আদর্শবাদ তাহার মাথায় চাপিয়াছে এবং সেই আদর্শবাদকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে সে সকল প্রকার পীড়ন সানন্দে সহ্য করিত। এ বিষয়ে ঘোড়া বা অন্যান্য ইতর প্রাণীর চেয়ে মানুষের সঙ্গেই তাহার মিল বেশী দেখা যাইত। কাপড় বহনে তাহার আপত্তি যত বাড়িল, মোতিয়াকে বহনে তাহার আসক্তি বাড়িল ততোধিক। সে এখন সুযোগ পাইলে মোতিয়াকে পিঠে তুলিয়া লইয়া মাঠের মধ্যে ছুটাছুটি করে। কারণ সে দেখিয়াছিল যে ঘোড়াতে পিঠে সোয়ার লইয়া চলাফেরা করে। সেই-বা না করিবে কেন, সে তো নিশ্চয়ই জানিয়াছে যে সে গাধা নয়, সে ঘোড়া।

ক্রমে ক্রমে সে মোতিয়ার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। এখন তাহার পিঠে মোট চাপাইতে গেলে মোতিয়াই আপত্তি করে, বলে—ওটা আমার ঘোড়া। মোতিয়ার কথায় বৈজুর গাধা আবার তাহার বিশ্বাসের সমর্থন পাইল। সে বুঝিল যে সংসারে শিশু ও বালকেরাই সত্যসন্ধ, তাহাদের দৃষ্টিই বাস্তবসম্মত।

একদিন বৈজু বলিল, গাধাটা খচ্চর হয়ে উঠেছে, কোন কাজ করে না, ওটাকে বেচে দি।

শুনিয়া গাধাটি ও মোতিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে

লাগিল। পুত্রের চোখে অশ্রু দেখিয়া বৈজুর স্ত্রী বলিল, তোমার তো আরও কত গাধা রয়েছে; ওটা থাক, ওটা মোতিয়ার ঘোড়া।

গাধাটি আবার একবার নিজ বিশ্বাসের সমর্থন পাইল। এবারে আর শিশু বা বালকের অনভিজ্ঞ দৃষ্টি নয়, একজন প্রবীণার দৃষ্টি।

যাই হোক, সে বস্তুতঃ ঘোড়া বলিয়াই হোক কিম্বা মোতিয়া ও তাহার মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই হোক অতঃপর বস্ত্রবহন কর্তব্য হইতে মুক্তি পাইল।

এখন সে সকাল-বিকাল মোতিয়াকে পিঠে তুলিয়া দৌড়ায়। তাহার বিশ্বাস ঘোড়ার মতো দৌড়ায়, যদিচ পরশ্রীকাতর লোকেরা বলে—দেখো, দেখো, গাধাটা কেমন ছুটছে!

একদিন বৈজুর গাধা নিকটবর্তী এক জলাশয়ের ধারে গেল। সে দেখিতে পাইল যে জলাশয়ের অপর তীরে একটি ঘোড়া চরিতেছে। সে ভাবিল, এই অবসর, ঘোড়ার সঙ্গে তাহার অবয়বের মিলটা ভালো করিয়া দেখিয়া লইতে হইবে। সে জলের ধারে দাঁড়াইয়া নিজের ছায়া দেখিতে লাগিল এবং ঘোড়ার সঙ্গে নিজ অবয়বের কোন বৈষম্য খুঁজিয়া পাইল না। নিজের ছায়া ও ঘোড়াটির কায়া গবেষণা করিয়া উভয়ের মধ্যে সে হুবহু মিল আবিষ্কার করিল। কেবল মুস্কিলে পড়িল কণ্ঠস্বর লইয়া। ঘোড়ার কণ্ঠস্বর কেমন মিহি আর তাহার নিজেরটা! নাঃ, বর্ণনা করিতেও লজ্জা বোধ করে। তারপরে ভাবিল, ওখানে একটু খুঁৎ থাকিলেও ঘোড়ার উপরে তাহার অন্য জায়গায়

জিং। ঘোড়ার লেজের চেয়ে তাহার লেজটি সুশ্রী। সে ভাবিল, ঘোড়ার লেজের শ্রী নাই, কেমন একটা সস্তা দামের চামরের মতো—আর তাহার, আহা কি সুন্দর, যেন একটি ছড়ির আগায় কিছু লোম জড়ানো। এমনিটিই তো হওয়া দরকার। এই বলিয়া বার কয়েক লেজটি নাড়িয়া জলের মধ্যে তাহার দোদুল্যমান ছায়া দেখিয়া অভূতপূর্ব গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিল।

এই সময়ে একদিন পথে বিজ্ঞাপন দেখিল যে শীঘ্রই শহরে ঘোড়দৌড় হইবে। সে স্থির করিল যে ঘোড়দৌড়ে নামিবে। আর, একবার ঘোড়দৌড়ে নামিতে পারিলে তাহার ঘোড়াত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। তখন আসন্ন ঘোড়দৌড়ের মহড়ার উদ্দেশ্যে সকাল-বিকাল মোতিয়াকে পিঠে লইয়া মাঠের মধ্যে সে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

ঘোড়দৌড় সুরু হইয়াছে। অনেকগুলি ঘোড়া ছুটিতেছে। এমন সময়ে সকলে আবিষ্কার করিল যে একটা গাধাও ছুটিতেছে।

কেহ কেহ চীৎকার করিয়া উঠিল—ওটাকে বের করে দাও।

অনেকে বলিল—এখন বের করা অন্যায় হবে, ঢোকালে কেন?

অধিকাংশ লোকে গাধার দৌড় দেখে নাই, বিশেষ ঘোড়ায়-গাধায় প্রতিযোগিতা কে কবে দেখিয়াছে! তাহারা বলিল—না-না, থাক্, বেশ হচ্ছে!

জনতার নানা জনে নানা মন্তব্য করিতে লাগিল।

—আরে আবার একটা সোয়ার পিঠে নিয়েছে, দেখো না ?

—বেশ ছুটছে তো ?

—হয় তো গাধা নয়, অন্য কোন জাতের ঘোড়া !

সেদিনের সেই শিশুটি পিতার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল—বাবা, ঘোড়া ঘোড়া।

বৈজুর গাধার কানে উক্ত বাক্য গেল, সে আরও উৎসাহিত হইয়া ছুটিতে লাগিল।

সকলে হাততালি দিয়া বলিতে লাগিল—বেড়ে ভাই বেড়ে ! দাও তো ঘোড়াগুলোকে হারিয়ে !

এমন সময়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। ঘোড়াগুলো এতক্ষণ প্রতিযোগিতাতেই ব্যস্ত ছিল, গাধাটাকে দেখিতে পায় নাই। এবারে গাধাটাকে দেখিতে পাইল এবং দেখিতে পাইবামাত্র সকলে হী হী চিঁহি চিঁহি রবে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে কয়েকটা ঘোড়ার তো পেট ফাটিয়া গেল, বাকী সবগুলা মাটিতে শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া হাসিতে লাগিল—'রেস' মাথায় উঠিল !

ওদিকে কর্তব্যপরায়ণ বৈজুর গাধা মোতিয়াকে পিঠে লইয়া যথারীতি ছুটিতে লাগিল এবং জনতার করতালি ও উল্লাসধ্বনির দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লক্ষ্যস্থলে আসিয়া পৌঁছিল। সে কেবল প্রথম হয় নাই, একাকীই লক্ষ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

তখন জনতার সে কি উল্লাস ! সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কেহ মুখের কাছে একমুঠা ঘাস ধরে, কেহ লেজটি

নাড়িয়া দেয়, কেহ বলে, এ কখনও গাধা নয়। কাছেই একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ ছিলেন, তিন বলিল, না-না, গাধা নয়, এ এক শ্রেণীর ঘোড়া, প্রাচীনকালে অনেক দেখতে পাওয়া যেতো, এখন খুব 'রেয়ার' বা বিরল হ'য়ে পড়েছে। সরকারে লিখে এটি আমি চিড়িয়াখানার জন্যে কিনে নেবো।

টাকা-পয়সার ব্যাপার আছে বুঝিতে পারিয়া বৈজু ধোপা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে, ওটি আমার গাধা। সকলে তাহাকে ঠগ ধাপ্পাবাজ বলিয়া মারিয়া তাড়াইয়া দিল।

তখন প্রশ্ন উঠিল—ঘোড়দৌড়ের 'কাপটি' তাহাকে দেওয়া হইবে কিনা ?

অনেকে বলিল—এটি ইহারই প্রাপ্য, গাধা হইলে না দিলেও চলিত, কিন্তু প্রাণীতত্ত্ববিদ্ স্বয়ং ইহাকে একশ্রেণীর ঘোড়া বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তারপরে জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে উহার গলায় 'কাপটি' বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

অতঃপর কি হইল ? উক্ত প্রাণীতত্ত্ববিদের পরামর্শে বৈজুর গাধা (এখন আর উহাকে গাধা বলা উচিত নয়) সরকার কর্তৃক ক্রীত হইয়া চিড়িয়াখানায় নীত হইয়া একটি ঘরে স্থান পাইল। পাছে অজ্ঞ দর্শক উহাকে গাধা বলিয়া অবজ্ঞা করে সেইজন্য তাহার খাঁচার কাছে একজন অফিসার প্রহরায় নিযুক্ত থাকে, দর্শকদের সমাঝাইয়া দেন—"প্রাণীটাকে দেখিতে গাধা বলিয়া মনে হইলেও উহা গাধা নয়, একশ্রেণীর ঘোড়া, প্রাচীনকালে

অনেক দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন খুব বিরল, বস্তুতঃ এ পর্যন্ত এই একটি মাত্র নমুনাই পাওয়া গিয়াছে।” দর্শকে সেই বিরল নমুনা দেখিয়া বলাবলি করে—বাগানে প্রবেশের দক্ষিণাটা বৃথা যায় নাই।

মোতিয়া মাঝে মাঝে গিয়া তাহাকে তৃণমুষ্টি দিয়া আসে। উক্ত প্রাণী (এখন আর গাধা বলিবার উপায় নাই) তাহার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। একদিন সেই শিশুটি (এখন কিছু বড় হইয়াছে) পিতার সঙ্গে চিড়িয়াখানায় গিয়াছিল। প্রাণীটাকে দেখিয়া সে বলিল—বাবা, একটা গাধাকে এত যত্ন করে রেখেছে কেন ?

বাবা বলিল—না-না, গাধা নয়, শুনলে না সরকারী লোক বলল যে এক শ্রেণীর ঘোড়া, এখন খুব বিরল। এর খুব দাম।

একদিন বৈজু ধোপা তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল।

ভূতপূর্ব গাধা, এখন বিরল শ্রেণীর অশ্ব তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

বৈজু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—নেমকহারাম !

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ

মহারাজবংশের ভ্রাতৃযুদ্ধের অনেক কারণ মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে, আরও অনেক কারণ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু আমি একখানি প্রাচীন গ্রন্থে ভ্রাতৃযুদ্ধের মূল কারণ বর্ণিত দেখিয়াছি। উহা আমার মনে ধরিয়াছে, এখানে তাই বিবৃত করিতেছি।

সেই প্রাচীন গ্রন্থে লিখিতেছে—একদিন দ্রৌপদীর দাসী বিন্তি কাপড় কাচিবার উদ্দেশ্যে দুর্যোধনের খিড়কির পুকুরে গিয়াছিল। তখন ভানুমতীর দাসী সরলা কাপড় কাচিতেছিল। বিন্তিকে দেখিয়া সরলা বলিল—হ্যাঁলা বিন্তি, আজ যে বড় এখানে ?

বিন্তি বলিল—আমাদের পুকুরে আজ এখন রাণী-দিদিরা নাইতে নেমেছেন, তাই রাণী-মা বললেন, ওরে বিন্তি তুই আজ ঐ পুকুরে যা।

সরলা বলিল—তা এইছিস বেশ করেছিস, দেখিস জল ছিটোস্ নে যেন!

বিন্তি বলিল—কাপড় কাচতে গেলে একটু-আধটু জল ছিটোবে বই কি!

—জল ছিটোতে হলে নিজেদের পুকুরে যা।

—কেন দিদি, রাণী-মা বললেন যে এ পুকুরে তাঁদের অংশ আছে।

—বটে ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ?

—মুখ আবার ছোট কিসের ? আমি ছোট লোক, আমার না-হয় ছোট মুখ, কিন্তু রাণী-মার মুখ তো বড় ।

—কার কত বড় মুখ সব জানা আছে। তোর রাণী-মা বুঝি আবার বনে যেতে চায় ?

বিন্তি বলিল—বালাই, ষাট, আবার বনে যাবে কেন ?

—তবে সাবধানে কাপড় কাচ্, জল ছিটোছিটি করিসনে।

—একশবার করবো। তোর কথা শুনব নাকি ? আমাদের পুকুরে আমি কাপড় কাচছি।

এই বলিয়া সে যথারীতি কাপড় কাচিতে সুরু করিল এবং জল যথারীতি ছুটিয়া সরলার গায়ে গিয়া পড়িল।

সরলা বলিয়া উঠিল—তবে রে চুলোমুখী ?

সরলা বলিল—জানিস তোকে আমি দূর করে দিতে পারি ?

—সে তোর সাধ্য নয়, যা তোর রাণী-মাকে গিয়ে পাঠিয়ে দে !

—কি ? আমার রাণী-মা আসবে তোকে দূর করতে ? কেন তাঁর কি পাইক-পেয়াদা নেই ?

—যা তবে তাই পাঠিয়ে দে।

তখন সরলা অধৌত বস্ত্রগুলি লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল। বিন্তি দেখিল, ব্যাপার সঙিন, তাই সে-ও কাঁদিতে কাঁদিতে অসংস্কৃত বস্ত্রাদি লইয়া প্রস্থান করিল।

সরলা একেবারে ভানুমতীর পায়ের উপরে গিয়া পড়িল, ভানুমতী তখন বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন।

ভানুমতী শুধাইলেন—আজ আবার কি হ'ল রে?

—আর কি হবে মা? এবার আমাকে বিদায় দাও।

—কেন রে?

—আমাকে না-হয় যা মুখে আসে তাই বলল, কিন্তু তোমাকে যে নিন্দে করে তা শুনতে পারি না।

—কে বলল? কি বলল?

ছোট হিস্তার রাণী-মার দাসী।

—কে, বিন্তি? সে তো ভালো মেয়ে রে!

—সামনে অমন ভালো মানুষ সাজতে সবাই পারে। আড়ালে কেমন মুখ দেখনি তো?

—যদি না দেখে থাকি তবে তুই বল্ না।

—সে-সব কথা মুখে আনতে নেই মা।

—তবু শুনি না?

—বলল যে তুমি নাকি পরের জমিদারি খাচ্ছ; ও-রকম পরের পয়সায় বাবুগিরি অনেকেই করতে পারে। বলল,—এবারে পাঁচ ছোটবাবু যে-সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছে, ও বাড়ীর বাবুদের নাক-কান কেটে ছেড়ে দেবে।

—হ্যাঁরে সত্যি? এইসব কথা বললে?

ভানুমতীর কথা শুনিয়া সরলা পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল, বলিতে লাগিল—তা' মা, আমাদের কথা বিশ্বাস করবে কেন? আমরা যে ছোটনোক, না হয় তোমার বিশ্বাসী বিন্তিকেই ডাকি,

শুধিয়ে দেখো !

—আর কি বলল ?

—বলল যে এবারে ও-বাড়ীর বাবুরা তোমাদের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে। বলল, তোমাদের সব গাছের বাকল পরিয়ে বনে পাঠিয়ে দেবে—আর তখন বিন্তি মনের আনন্দে তোমার খিড়কি পুকুরে হেঁইও-হেঁইও ক'রে জল ছিটিয়ে কাপড় কাচবে।

এই বলিয়া সে ধূলোয় লুটোপুটি করিয়া কাঁদিতে লাগিল, বলিল—এবার আমাকে বিদায় দাও মা, ছোট মুখে তোমাদের নিন্দে আর শুনতে পারি না। তোমরা বড়লোক, তোমাদের সহ্য হয়, আমাদের ছোটনোকদের যে অসহ্য !

সমস্ত শুনিয়া ভানুমতী বঁটিখানা লইয়া সরোষে প্রস্থান করিলেন।

বলা বাহুল্য, বিন্তিও অনুরূপ সত্য কথা দ্রৌপদীর কাছে বলিল। তিনিও তখন তরকারি কুটিতেছিলেন। তিনিও বঁটিখানা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

একই শুভলগ্নে ভানুমতী ও দ্রৌপদী বঁটি হস্তে-স্ব স্ব স্বামীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

দুর্যোধন তখন সকালবেলায় একা বসিয়া হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতেছিলেন, ভানুমতী ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—এই বঁটিখানা আমার গলায় বসিয়ে দাও। এই নাও, বলিয়া বঁটিখানা স্বামীর পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন।

বিস্মিত দুর্যোধন বলিলেন—আবার কি হ'ল ?

—আর কি হবে ? যা হ'বার নয় তাই হ'য়েছে।

—কত কি হ'তে পারে, তবু শুনি।

তখন সরলা যে-সব কথা প্রাকৃত ভাষায় বলিয়াছিল তাহাই কিঞ্চিৎ সংস্কৃত করিয়া ভানুমতী বলিলেন।

দুর্যোধন শুধাইলেন—এসব কথা কি বিন্তি তোমাকে নিজে এসে বলে গিয়েছে ?

—তা বিশ্বাস করবে কেন ? না-হয় তোমাদের ধর্মপুত্তুরকে শুধিয়ে দেখ।

—বিন্তির তো এত বড় সাহস হবার কথা নয়।

—সাহস কি সহজে হয় ? পিছনে লোক আছে।

—কে ?

—কে ! আহা কিছুই জানো না যেন !

—দ্রৌপদী ?

—শুধু তার কাজ নয়।

—তবে কি যুধিষ্ঠিরদাদাও আছেন ?

—আহা কত সাধের দাদা আমার !

—তিনি তো এমন নন !

নাঃ, বড় ভালোমানুষ ! যাও গিয়ে দাদার পাদোদক খাওগে, আমি ঐ খিড়কি-পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে মরবো। তারপরে যক্ষ হ'য়ে ঐ পুকুর আগলাবো। দেখি, আমার পুকুরে ওরা কেমন ক'রে কাপড় কাচে।

এই বলিয়া ভানুমতী সবেগে প্রস্থান করিলেন।

দুর্যোধন অনেকদিন হইল স্ত্রীকে লইয়া ঘর করিতেছেন, তাই স্ত্রীর এবম্বিধ অভিপ্রায় প্রকাশে মোটেই বিচলিত হইলেন না। কিন্তু ভানুমতীর অন্য কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না, মনে মনে স্থির করিলেন, না, পাণ্ডবগণের সঙ্গে কিছুতেই আপোষ করা নয়, সত্যই উহাদের বড় বাড় হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যেও অনুরূপ কথোপকথন হইল। দ্রৌপদী যে-সব যুক্তি দিয়াছিলেন তন্মধ্যে বঁটিখানা তীক্ষ্ণতম। যুধিষ্ঠির স্থির করিলেন, না, কৌরবগণের সঙ্গে কিছুতেই আপোষ করা নহে, সত্যই উহাদের বড় বাড় হইয়াছে।

যে ঘটনার কথা বলিলাম তাহা উদ্যোগ-পর্বের অন্তর্গত কাল। কয়েকদিন হইল পাণ্ডব ও কৌরবগণের মধ্যে আপোষ-আলোচনা চলিতেছে। পাণ্ডবপক্ষের দূত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। আলোচনার গতি আশাপ্রদ, অনেকেই আশা করিতেছে যে এবারে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই ভরসাতে ব্যবসা-বাণিজ্যে তেজী ভাব দেখা দিয়াছে (যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসায় ছাড়া). লোকজনের মুখ প্রফুল্ল। কিন্তু দৈব আর কাহাকে বলে? যেদিন আপোষের সর্ত লিখিত হইবার কথা, সেইদিন সকাল-বেলাতে পূর্বোক্ত ঘটনা ঘটিয়া গেল এবং তাহারই প্রভাবে সমস্ত বিপরীত-বিপরীত হইয়া বসিল।

শান্তি-প্রস্তাব-আলোচনা সভায় দুর্যোধন আসিয়া বাঁকিয়া

বসিলেন, বলিলেন—বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিটুকুও দান করবো না।

সকলে বিস্মিত হইল। এ কি কথা, কাল তো সব প্রায় স্থির হইয়া গিয়াছিল। সকলেই ভাবিল ইহা দুর্যোধনের অহঙ্কারজাত দুর্বুদ্ধি। আসল কারণ কেহ জানিতে পারিল না।

ওদিকে দ্রৌপদীও কৃষ্ণের কান ভারি করিয়া রাখিয়াছিলেন; যুধিষ্ঠিরের কানও ভারি করিয়া রাখিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্য চার ভাই তাঁহাকে সভাতে যাইতে দেন নাই, কি করিতে কি করিয়া বসেন, দাদার বুদ্ধির উপরে তাঁহাদের আর বিশ্বাস ছিল না।

দুর্যোধনের অনমনীয় মনোভাব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আর নতি স্বীকার করা উচিত মনে করিলেন না, বিশেষ দ্রৌপদীর কথাগুলি তাঁহার মনে ছিল। তাই তিনি আসন্ন মহাযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া সভা ত্যাগ করিলেন। ভ্রাতৃ-যুদ্ধ বন্ধ হইবার শেষ আশা লোপ পাইল।

অতঃপর কি ঘটিল সকলেই জানেন। কিন্তু সকলে যাহা জানিতেন না, ভ্রাতৃ-যুদ্ধের সেই মূল কারণ এখানে বিবৃত হইল।

শাশুড়ী

অরিন্দম একজন প্রগত যুবক। সে যখন-যেমন তখন-তেমন চলিতে জানে, একচুল এদিক-ওদিক হয় না ; ফল কথা, কালের করতালিতে তালে তালে নর্তন যদি মনুষ্য জীবনের আদর্শ হয়, তবে সে একজন আদর্শ মানুষ। তবে এত বিস্তারিত ভাবে না বলিয়া সংক্ষেপে 'প্রগত' বলিব, কারণ 'প্রগত' শব্দটিই প্রগতির একটি লক্ষণ, অনেকে মনে করেন একমাত্র লক্ষণ।

অরিন্দম মোটা মাইনের সরকারী চাকুরে। সে এক সময়ে বিলাতী স্যুট পরিত, তারপরে বুশ সার্ট, হাওয়াই সার্ট অতিক্রম করিয়া বর্তমানে বিদেশী অভিনেত্রীর ছাপ-মারা ঢিলা জামা গায়ে দেয়। প্রগতির হাওয়া একবার পালে লাগিলে আর থামিয়া থাকিবার উপায় নাই, স্রোতের টানে, হাওয়ার ঠেলায় আগাইয়া চলিতেই হইবে। প্রগতির মুখে আত্মসমর্পণ করিলে নিজের ইচ্ছায় চলিবার উপায় আর থাকে না।

চাকরিতে একটা প্রমোশন পাইয়া মোটা বেতন বৃদ্ধি হইতেই পত্নী নিরুপমা বলিল—এবারে রেডিও-সেট কেনো।

অরিন্দম বলিল—ঠিক, ওটা না হ'লে আর চলে না।

প্রগতির একটা নিয়ম, আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিয়া চলা। তাই একদিকে খরচ বাড়িলে আর একদিকে খরচ কমাইতে হয়।

অরিন্দম তাহার ছোট ভাই অরবিন্দকে বলিল—দেখ্, আজকাল পড়ে-শুনে কোন লাভ নেই, পড়া ছেড়ে দে, দিয়ে কাজ-কর্মের চেষ্টা দেখ্।

অরবিন্দ কলেজ ছাড়িয়া চাকরির সন্ধানে বাহির হইল। তাহার কলেজের বেতন ও আনুষঙ্গিক খরচ রেডিও-সেটের দোকানে চলিয়া গেল। পরদিন সন্ধ্যাবেলায় সপরিবারে অরিন্দম যখন রেডিও-যন্ত্রের সম্মুখে বসিল, তখন শুনিতে পাইল আবৃত্তি হইতেছে—

'আপনারে লয়ে বিব্রত থাকিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে' ইত্যাদি।

অরিন্দম বলিল—এ যুগের এই তো বাণী!

এবারে অরিন্দম বলিল—একটা টেলিফোন না হ'লে আর চলে না।

পত্নী নিরুপমা বলিল—আমার বন্ধুনীদের সঙ্গে কথাবার্তা বল্‌তে ভারি অসুবিধে হয়।

অরিন্দম জানে যে এককালীন আড়াই হাজার টাকা জমা দিলে টেলিফোন পাওয়া সম্ভব, কিন্তু আড়াই হাজার টাকা আসে কোথা হইতে? ধার করিয়া বা পুঁজি ভাঙ্গিয়া? ওসব তো প্রগতিসঙ্গত নয়। অন্য কোন খাতে ব্যয় কমাইতে হইবে।

তাহার বোন মণিমালা এবার বি-এ পাশ করিয়াছে। তাহার বিহাহের জন্য মৃত্যুর পূর্বে তাহার পিতা আড়াই হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

নিরুপমা বলিল—ঐ টাকা না-হয় নাও।

—ওটা যে মণিমালার টাকা।

—তার জন্যে এ পর্যন্ত অনেক আড়াই হাজার তুমি খরচ করেছ, ও-টাকায় তোমার অধিকার জন্মেছে।

—কিন্তু ওর বিয়ে তো দিতে হবে?

—দিতেই হবে তার কোন মানে আছে? আজকাল কত মেয়ে বিয়ে না ক'রে দিব্যি সুখে আছে। তাছাড়া ও তো পাশ করেছে, চাকরি খুঁজে নিলে বেশ আরামে থাকবে, আমার মতো ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া অরিন্দম বুঝিল পত্নীও বেশ প্রগত হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন সে মণিমালাকে ডাকিয়া বলিল—ওরে, আমি তোর বিয়ের চেষ্টা দেখবো না তুই একটা চাকরির চেষ্টা দেখবি?

এ-রকম প্রশ্নের যে-রকম উত্তর প্রত্যাশিত, মণিমালা তাহাই বলিল—না দাদা, আমি বরঞ্চ চাকরির চেষ্টাই দেখি।

—এই তো চাই। স্বাধীন জীবনযাত্রাই মানুষের আদর্শ হওয়া আবশ্যক, কারো উপরে নির্ভর করা কিছু নয়, হোক না সে স্বামী!

মণিমালা শিক্ষয়িত্রী হইয়া জোড়হাটে চলিয়া গেল। পরদিন অরিন্দমের বাড়ীতে টেলিফোন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

নিরুপমা বলিল—মোটর ছাড়া আর তো চলে না।

অরিন্দম বলিল—হাঁ, আমার অফিস যেতে খুব অসুবিধা হয়।

—তা না-হয় হোক, কত লোকেই তো ট্রামেবাসে যায়। আমি যে বন্ধুনীদের কাছে মুখ দেখাতে পারিনে।

অরিন্দম মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল ভাই-বোন গিয়াছে। বিনিময় করিবার মতো তাহার হাতে আর কিছু তো নাই।

তাই সে বলিল—ধার করা তো চলে না?

—ধার করবে কেন? কারো কাছে হাওলাত করো।

অরিন্দম বুঝিল, অবুঝ নারীকে ধার ও হাওলাতের প্রভেদ বোঝান সম্ভব হইবে না। সে আপন মনে সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় থাকিল।

তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে ও অনিদ্রায় কাটাইয়া চতুর্থ দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে একাকী গড়ের মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা অরিন্দম ফুকারিয়া উঠিল—শাশুড়ী, শাশুড়ী।

এখন শাশুড়ীর তাৎপর্য বুঝিতে হইলে অরিন্দমের পারিবারিক ইতিহাস একটু জানা আবশ্যক।

নিরুপমার মাতা স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁদের একমাত্র সন্তানের কাছে আসিয়া আজ পাঁচ-ছয় বৎসর হইল বাস করিতেছেন। সংসারে তাঁহার আর কেহ নাই বলিলে কম বলা হয়, তাঁহার কেহই নাই এবং কিছুই নাই। গ্রামে একখানা বাড়ী ও সামান্য ২।৪ বিঘা ব্রহ্মত্র অবশ্য আছে।

অরিন্দম স্থির করিল, শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে দেশে পাঠাইতে পারিলে একটা খরচ বাঁচে এবং সেই পথে মোটর ঢুকিতে পারে।

স্ত্রী বলিল—কতই আর বাঁচবে?

—তা মন্দ কি! ধরো মাসে খোর-পোষ ওষুধ-পত্তর নিয়ে যদি ৭০্ টাকা হয়—

স্ত্রী বলিল—আর যে-ঘরটায় থাকেন ওটার ভাড়া ধরো।

—ঠিক, ৫০্ টাকা। তাহ'লে দাঁড়ালো মাসে ১২০্ টাকা, অর্থাৎ বছরে ১৪৪০্ টাকা। তার উপরে আবার সুদ আছে।

—দশ বৎসরে কত দাঁড়ায় দেখো—

—এই টাকাটা বাঁচালে মোটর হয়।

স্ত্রী বলিল—'বুইক' হবে কি?

এবারে স্ত্রী একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিল—কিন্তু বুড়ো মানুষ অতদিন বাঁচবেন কি?

স্বামী বলিল—তা বলা যায় কি? সেকেলে বুড়োবুড়ীরাই বেশী বাঁচে।

স্ত্রী বলিল—তবে দাও গাঁয়ে পাঠিয়ে।

তারপরে নিজেকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যেই যেন বলিল—আমরা তো আর ওঁকে বনে পাঠাচ্ছিনে।

স্বামী বলিল—পাঠালেই বা ক্ষতি ছিল কি? রামের মতো আদর্শ পুরুষেও তো সীতাকে বনে পাঠিয়েছিলেন।

একটা পৌরাণিক নজির পাইয়া নিরুপমা নিজেকে অত্যন্ত মহান্ মনে করিতে লাগিল।

পাঠক, অরিন্দম ও নিরুপমাকে তোমরা হীন মনে করিও না। মানুষ হীনও নয়, মহৎও নয়, মানুষ নিজ ইচ্ছার দাস। মনের আকাঙ্খা অনুসারে যুক্তি ও নজির তাহার হাতের কাছে আসিয়া আপনি হাজির হয়। ঠিক যে পরিমাণ বুদ্ধি থাকিলে

নিজের নকল প্রকার কার্যকে সমর্থন করা যায় মানুষ সেই পরিমাণ বুদ্ধির অধিকারী।

তিন দিন পরে অরিন্দমের শাশুড়ী স্বগ্রামে চলিয়া গেলেন। পরদিন দশটার মধ্যে, ইস্ত্রিকরা, পাড়া-পড়শীর ঈর্ষ্যা-জাগানো প্রকাণ্ড বুইকগাড়ী অরিন্দমের বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিল। সন্ধ্যাবেলায় স্বামী-স্ত্রীতে সাজিয়া-গুজিয়া গাড়ীতে চাপিয়াছে—এমন সময় পিওন আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম অরিন্দমের হাতে দিল।

সে টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখিল, তাহার যে সরকার শাশুড়ীকে গ্রামে রাখিতে গিয়াছিল সে জানাইতেছে—'শাশুড়ী ঠাকরুণ আজ সকালে হৃদ্‌রোগে মারা গিয়াছেন।'

নিরুপমা টেলিগ্রাম পড়িয়া ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিল—মা তুমি যে এমন ক'রে ফাঁকি দিয়ে যাবে ভাবি নি।

মায়ের মৃত্যুতে অল্প মেয়েই এমন সার্থক কান্না কাঁদিয়াছে।

অরিন্দম বুঝিল নিরুপমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, শাশুড়ী ঠাকরুণ তাহার সমস্ত হিসাব বানচাল করিয়া মারা গিয়াছেন। তাহার মনে হইল এ মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, কেবল তাহাকে জব্দ করিবার জন্যই বুড়ী যেন অকালে মরিলেন।

অকৃতজ্ঞ! দশ বৎসর তাঁহাকে পালন করা হইল—আর দশটা বৎসর বাঁচিলে কি ক্ষতি ছিল? এমন করিয়াই কি পথে বসাইতে হয়?

শেষ পর্যন্ত অরিন্দমকে সেই বে-হিসেবী মোটরখানাই কিনিতে হইল। হিসাবের বাঁধ ভাঙিয়া অকস্মাতের বন্যা

প্রগতির পাকা ধান ক্ষেতের উপরে এক বুক জল দাঁড় করাইয়া দিল।

ভগবান ও বিজ্ঞাপনদাতা

—কাকে চাই ?

—ভক্তকে।

—ভক্তবাবু বেরিয়ে গেছেন।

—তবে আপনাকেই চাই।

—কি দরকার ?

—একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে।

—মশায়ের কি নাম ?

—ভগবান্।

—ভগবান্ সা ?

—না।

—ভগবান্ বিশ্বাস ?

—বিশ্বাস করলেই ভগবান।

—এখন মস্করা রাখুন, নাম কি ?

—ঐ যে বল্লাম ভগবান্।

—কোন্ ভগবান্ ?

—ভগবান্ তো এক !

—ঠিক ক'রে বলুন ?

—ঠিক ক'রেই বলছি, আমি আসল ভগবান্। যাকে আপনারা গড, হরি, ইত্যাদি ব'লে থাকেন।

—ওঃ, তাই বলুন ! তা কি দরকার ?

—আপনাকে মুক্তি দিতে চাই।

—আমি এখন বড্ড ব্যস্ত। আচ্ছা আপনি এখন আসুন।

বিশ্বাসী পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে উপরিউক্ত কথোপকথন ভগবান্ ও একজন মানুষের মধ্যে হইতেছিল। মানুষটি একখানি মাসিক পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ। সময় বেলা আড়াইটা। স্বয়ং ভগবান্ যাচিয়া উক্ত মানবকে দর্শন দিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত মানব বড়ই ব্যস্ত তাই ভগবান্ অনাদৃত হইলেন, না পাইলেন স্বাগত, না পাইলেন একখানি বসিবার আসন। বিড়ম্বিত ভগবান্ পত্রিকা অফিসের এক কোণে দাঁড়াইয়া সংসারের হাল-চাল দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে অপর ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। সে দেব-অংশী নয়, নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাহাকে দেখিবামাত্র কর্মাধ্যক্ষ লাফাইয়া উঠিয়া নিজের আসনখানি ছাড়িয়া দিয়া বলিল—বসুন, বসুন। সেই ব্যক্তি বলিল—আহা, ব্যস্ত হবেন না।

—ব্যস্ত হ'ব না ! বলেন কি ! কতদিন পরে দেখা ! আরে চা আর টোষ্ট নিয়ে আয়। নিন একটা সিগারেট নিন।

লোকটি সিগারেট গ্রহণ করিল।

কর্মাধ্যক্ষ বলিল—পূজো সংখ্যা ছাপা প্রায় শেষ। এবারে বিজ্ঞাপনগুলো না পেলে তো আর চলে না!

—বাজার বড় খারাপ। বড় বড় পার্টি সব হাত গুটিয়েছে।

—সেই জন্যেই তো আপনার মতো 'ভেটারেন'কে ধরেছি। কিছু না দিলে তো মারা যাই।

কিছু বেশী কমিশন দিতে হবে।

—তা হবে বই কি!

—তবে কপি নিন।

কর্মাধ্যক্ষ উৎসাহে পুনরায় লাফাইয়া উঠিয়া বিজ্ঞাপনের কপি ও লোকটির পদধূলা গ্রহণ করিল, ভগবান্ আপনার ভালো করবেন।

—তাঁর ভরসাতেই কোন রকমে তো চালাচ্ছি।

যাঁর ভরসার উপর ইহাদের নির্ভর, সেই খোদ ভগবান্ অদূরে দাঁড়াইয়া সব দেখিলেন ও ম্লানভাবে হাসিলেন।

অভিজ্ঞ পাঠক বোধ করি আবার বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই লোকটি বড় বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কোম্পানীর এজেণ্ট। কাজেই যে-খাতির সে পাইল তাহা নিতান্তই তাহার প্রাপ্য।

তার পরে চা আসিল, টোষ্ট আসিল, পূরা এক প্যাকেট সিগারেট আসিল। তাহার ধূম-কুণ্ডলীর অন্তরালে অদৃশ্যপ্রায় ভগবান্ সমস্তই দেখিলেন, আর একটি ভাগবত দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন, মনে মনে বলিলেন, হায়, ইহারা কি সব অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার লইয়া মগ্ন আছে।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, সেই সঙ্গে মনের গোপনে

একটুখানি যেন ঈর্ষার মতোও অনুভব করিলেন।

তারপর উক্ত বিজ্ঞাপনদাতা অফিস হইতে বাহির হইবা-মাত্র ভগবান্ তাহার উদ্দেশ্যে বলিলেন—মশায়, আমাকে একটা এজেন্সি দিতে পারেন ?

লোকটি ভগবানের আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল—যা চেহারা আর পোশাক ! না একেবারেই অচল। তা অনেক টাকা জামিন দিতে হবে যে—পারবে ?

চরাচরের একমাত্র মালিককে স্বীকার করিতে হইল যে ইহা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

—তবে ?

—কি উপায় বলুন ?

—তুমি করো কি ?

—সংসারে ঘুরে বেড়াই।

—থাকো কোথায় ?

—সর্বত্র।

—ওঃ ভবঘুরে ? তাই বলো ! না বাপু, তোমাকে দিয়ে হবে না। পার্টির কাছ থেকে বিজ্ঞাপন আদায় করা যে-সে লোকের কর্ম নয়। তুমি তো তুমি, স্বয়ং ভগবানেরও অসাধ্য।

—তাই তো দেখছি !

—আমি খুব ব্যস্ত আছি, এখন চললাম।

লোকটি প্রস্থানে উদ্যত হইলে, অসহায় ভগবানের মুখ দিয়া অজ্ঞাতসারে বাহির হইল—মানুষ ! মানুষ !

—ও আবার কি ?

—মানুষ বিব্রত হইলে ভগবান্ ভগবান্ বলে, আমি ভগবান্, আমি আর কি বলবো, মানুষ মানুষ বলি।

—ওঃ তুমিই ভগবান্। তাই বলো। তা দেখা হয়ে খুশি হ'লাম। এক কাজ করো, চারদিকে ঘুরে ফিরে দেখো, কোথাও যদি কোন কাজ-কর্ম পাও। আজকাল আবার যা বেকার-সমস্যা। আচ্ছা, এখন চলি।

বলিয়া লোকটি দ্রুতপায়ে প্রস্থান করিল।

নিরুপায় ভগবান্ একাকী দাঁড়াইয়া আর একবার বলিয়া উঠিলেন—মানুষ! মানুষ!

রজ্জুতে সর্প

শেষ মুহূর্তে রেল-স্টেশনে গিয়া পৌঁছিলে কি বিপদই না হয়। সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বার্থ পাইবার আশা এক রকম ছাড়িয়া দিয়া ইণ্টার ক্লাসে চাপিব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময়ে যে টিকিটবাবুকে ইতিপূর্বে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম তিনি আসিয়া বলিলেন, আসুন, বোধ হয় একখানা বার্থ খালি আছে।

—কোথায় ?

—আসুন ওই গাড়ীখানায়।

তিনি আমাকে একখানা চার বার্থযুক্ত সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর সম্মুখে লইয়া গেলেন এবং একটা টর্চবাতি জ্বালিয়া দরজায় সংযুক্ত লেবেল দেখিয়া বলিলেন, এই গাড়ীতেই উঠে চ'ড়ে বসুন।

এই বলিয়া চতুর্থ শূন্য স্থানে আমার নাম লিখিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া চাপিয়া বসিলাম। অন্য তিনখানা বার্থ তখনও খালি।

ট্রেন ছাড়িবার সামান্য কিছুক্ষণ আগে একসঙ্গে তিন ব্যক্তি গাড়ীতে ঢুকিলেন এবং বাক্স বিছানা রাখিয়া একজন বলিয়া উঠিলেন—খুব খালি পাওয়া গেছে। আর একটু হ'লে কি মুশকিলই না হ'ত !

অপর দুইজন তাঁহাকে সমর্থন করিয়া নিজ নিজ বার্থে বিছানা পাতিয়া লইলেন। আমি ভাবিলাম, সঙ্গীদের পরিচয় জানা আবশ্যক, কিন্তু সরাসরি জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতা নয়। তাই

দরজায় আঁটা লেবেল পড়িবার উদ্দেশ্যে নামিয়া পড়িলাম এবং টর্চবাতির সাহায্যে লেবেল পড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম। আমার সহযাত্রী তিনজনেই প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক! কি সৌভাগ্য! কি আশ্চর্য!

একজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, অপরজনেও প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, তাহার উপর আবার ডাক্তার, আর তৃতীয়জন প্রসিদ্ধ সম্পাদক ও সমালোচক।

ইহাদের তিনজনেরই রচনার আমি ভক্ত পাঠক, ভাগ্যের না জানি কোন্ ইঙ্গিতে ইহারা আমার সহযাত্রী!

এক প্যাকেট সিগারেট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিলাম এবং মুখে-চোখে কৃতার্থতার ভাব প্রকাশ করিয়া সিগারেটের বাক্স তিন জনের সম্মুখে ধরিয়া বলিলাম, নিন স্যার।

সাহিত্যিকগণ বেশ অমায়িক আর উদার। হইবেনই বা না কেন! তিনজনে তিন ত্রিকুখে নয়টি সিগারেট লইয়া উদারভাবে দশমটি আমাকে দিয়া বলিলেন, দেশলাই আছে?

দেশলাই দিলাম।

এখন, আমার সমস্যা হইল ইহাদের কোন্জন কে? ভাবিলাম, ক্রমে কথাবার্তায় প্রকাশ পাইবে। ভাবিলাম, এটাও মন্দ খেলা হইবে না, কথাবার্তা হইতে সঠিক পরিচয় উদ্ধার করা যাক।

একজন একটু রোগা, আর দুইজন ঈষৎ স্থূল। সকলেরই বয়স পঞ্চাশের উপর বলিয়া মনে হইল। ইহাদের সকলেরই ছবি সংবাদপত্রাদিতে দেখিয়াছি। ওই রোগাজনই তবে প্রসিদ্ধ

ঔপন্যাসিক। কিন্তু ওই দুইজনের মধ্যে কে ডাক্তার কে সম্পাদক!

এমন সময়ে তাঁহারা এক সেট তাস বাহির করিয়া শুধাইলেন—তাস-খেলা আসে?

কৃতার্থভাবে জানাইলাম, আসে বই কি!

—তবে আর কি, ব'সে পড়ুন।

জীবনে তাস অনেক খেলিয়াছি, এমন সব দেশবিশ্রুত খেলুড়ী পাই নাই।

তাস ও গল্প চলিতেছে, আমার কান গোয়েন্দার মত সতর্ক, গল্পের ধারা হইতে পরিচয় সংগ্রহ করিতে হইবে।

একটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম, সাহিত্যিক-হাওয়া মোটেই বহিতেছে না। আমি হাওয়া তুলিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিলাম—আজকাল ভাল উপন্যাস বেশ লিখিত হচ্ছে।

রোগাজন বলিলেন—ও-সব পড়িনে মশাই।

বিস্মিত হইলাম না, কারণ জানিতাম যে ময়রা নিজে মিষ্টি পছন্দ করে না। শুনিয়াছিলাম যে এক দলের সাহিত্যিক অপরদলভুক্ত সাহিত্যিকের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। তাই অপরদলভুক্ত একজন ঔপন্যাসিকের নাম করিয়া বলিলাম—উনি বেশ লিখছেন আজকাল।

আশা ছিল যে, এই সূত্রে ক্রমে সাহিত্যের কথা উঠিবে ও ইঁহাদের পরিচয় প্রকাশ পাইবে।

—তা হবে, নিন, টেক্কা সামলান। বলিলেন অন্যতর স্থূল ব্যক্তি।

সাহিত্যিকেরা আশ্চর্য ব্যক্তি, ঘণ্টা দুই ইঙ্গিত চালাইবার পরেও না উঠিল সাহিত্যের কথা, না পাইলাম ইঁহাদের পরিচয়।

এবারে রোগাজনের একখানা প্রসিদ্ধ উপন্যাসের উল্লেখ করিয়া বলিলাম—ও-রকম সুন্দর বই আর পড়িনি।

—আপনি বুঝি বাংলা বই খুব পড়েন ?

—লিখতে পারি না, তাই পড়ি।

—আমরা লিখিও না, পড়িও না।

মনে মনে ভাবিলাম, চাঁদ, এসব ধাপ্পাবাজি অন্যের সঙ্গে ক'রো। আমি তোমাদের পরিচয় জেনে ফেলেছি।

—আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

—বেনারস।

—আপনারা ?

—মোগলসরাই।

—সেখান থেকে ?

—সেখানেই কিছুকাল থাকব। এরোড্রোম তৈরি করবার একটা কণ্ট্রাক্ট পেয়েছি।

মনে মনে তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। পরিচয় লুকাইবার কি সুন্দর কৌশল! কোথায় সাহিত্যিক আর কোথায় এঞ্জিনিয়ার। ভাবিলাম, পরিচয় না লুকাইয়াই বা উপায় কি ? কৌতূহলী জনতা যে বড়ই বিরক্ত করে।

অনেক রাত্রে যে-যার বার্থে শুইয়া পড়িলাম। শুইয়া শুইয়া নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, ইহাদের কোন্‌জন কে ? ভাবিলাম, কাল ভোরবেলা মোগলসরাইতে নামিবার আগে

জিজ্ঞাসা করিয়া লইব, ফাঁকি দিয়া যদি ওঁদের পরিচয় জানিতে পারিব, তবে আর ওঁরা সাহিত্যিক কিসের? সত্যের বিকল্প সৃষ্টিই যে সাহিত্যিকদের কাজ।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিয়া দেখি, তিনজনে উঠিয়া জিনিসপত্র গোছ-গাছ করিতেছেন—মোগলসরাই আসন্ন।

—কি, ঘুম হ'ল?

—খুব ঘুমিয়েছি। আপনাদের?

—আমরাও দিব্যি ঘুমিয়েছি, ভাগ্যে শেষমুহূর্তে বার্থক'খানা পেয়েছিলাম, নইলে সারাটা রাত জেগেই কাটাতে হ'ত।

—শেষমুহূর্তে পাবেন কেন? আপনাদের নামে তো আগে থেকে রির্জাভ করা ছিল।

—না-না, ওগুলো আমাদের নাম নয়!

—আপনাদের নাম নয়?

—যাঁদের যাবার কথা ছিল তাঁরা টেলিফোন ক'রে ক্যানসেল ক'রে দিয়েছিলেন, তাই তো পাওয়া সম্ভব হ'ল।

আমার আপাদমস্তক হিম হইয়া গিয়াছিল।

একজন বলিল—দেখ না হে, টিকিটখানায় কি কি নাম ছিল?

একজন দরজা হইতে টিকিটখানা টানিয়া লইয়া পড়িয়া বলিল, আরে—এ যে তিনজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের নাম!

—আপনি বুঝি আমাদের সাহিত্যিক ঠাওরেছিলেন?

—তাই বুঝি কাল রাত্রে নানা রকম সাহিত্যের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন? আমরা নিরেট এঞ্জিনিয়ার। আমাদের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ নেই।

—একেবারে নেই বলা যায় না, একরাত্রের জন্যে সাহিত্যিকের 'এক্‌টিনি' করতে হ'ল।

—মোগলসরাই। মোগলসরাই।

—নমস্কারান্তে তিনজনে নামিয়া গেলেন। আমিও জিনিস-পত্র গুছাইতে লাগিলাম। ভাবিলাম, ভাগ্য অপ্রসন্ন নয়, সত্যকার সর্পসর্শন না হইলেও রজ্জুতে সর্পদর্শন তো ঘটিয়া গেল!

তান্ত্রিক

জীবনে অনেক বিচিত্র কাজে হাত দিয়াছি, বলা বাহুল্য কোনটাই শেষ করিতে পারি নাই; ভালোই হইয়াছে, নতুবা একটা কাজ লইয়া সারা জীবন পড়িয়া থাকিলে অনেক কাজের অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত থাকিতাম।

প্রথম যৌবনে একবার ভূপর্য্যটক সাজিয়া বাহির হইয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে সীতারামপুর পর্যন্ত পৌঁছিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে ভূগোলের ক্লাসে পৃথিবীটাকে যত বড় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে, পৃথিবীটা তাহার চেয়ে কিছু বড়। অতএব আর কালবায় না করিয়া টিকিট কিনিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি ইতি-

মধ্যে শহরের অর্ধেক লোক খদ্দর ধারণ করিয়া চরকা কাটিতে স্থরু করিয়া দিয়াছে। আমিও খদ্দর ধরিলাম ও চরখা কিনিলাম। এমন সময় এক বন্ধু আসিয়া বলিল, সুতা-কাটা খুবই ভালো, কিন্তু তার চেয়েও ভালো পল্লী-উন্নয়ন। অতএব তাহার সঙ্গে পল্লী-উন্নয়নে লাগিয়া গেলাম অর্থাৎ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিতে লাগিলাম। এই সময়ে এক তান্ত্রিকের সঙ্গে জুটিয়া গেলাম এবং রীতিমতো রক্তাম্বর, রুদ্রাক্ষমালা এবং একটি প্রমাণ সাইজের নরকপাল সংগ্রহ করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার তান্ত্রিক গুরু অকস্মাৎ গাড়ীচাপা পড়িয়া সাধনোচিতধামে প্রস্থান করিল। তাহার কাছে শুনিয়াছিলাম যে পঞ্চকোট পাহাড়ের কাছে এক মহাতান্ত্রিক পুরুষ বাস করেন। আমি তাঁহার সন্ধানে চলিলাম। মুরাডি স্টেশনে নামিয়া পঞ্চকোট যাইতে হয়। একদিন শেষ রাত্রে মুরাডি-স্টেশনে নামিলাম। তখনো অন্ধকার আছে, স্টেশনের বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছি, আলো হইলে রওনা হইব, এমন সময়ে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল, লোকটি যে কাহিনী বিবৃত করিল তাহাই আজ বলিব। আবার বলা বাহুল্য যে তাহার কথা শুনিয়া তান্ত্রিকতার পথ ছাড়িয়া দিয়া হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি স্থরু করিলাম। অন্যান্য নূতন এডভেঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি সাইডডিস্‌রূপে সঙ্গে সঙ্গে রহিয়া গিয়াছে। ইহার যে কোথায় শেষ জানি না, তবে এ চিকিৎসা-পন্থার সুবিধা এই যে ইহাতে যেমন রুগী সারে না, তেমনি মরেও না ; যে সারে আপন ভাগ্যে সারে,

৫

যে মরে আপন দুর্ভাগ্যে মরে ; ডাক্তার যথাসম্ভব টাকাটা-সিকেটা ও 'হাতযশ' কুড়াইয়া লয়। যাক সে কথা। এখন গল্পটি বলি।

অন্ধকার কাটিবার আশায় অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম যে অদূরে আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া একটি লোক তামাক সেবন করিতেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাইলাম যে তাহার পরনে রক্তাম্বর, গলায় কয়েক ছড়া ছোট বড় রুদ্রাক্ষ মালা, ললাটে রক্তচন্দনের তিলক। একবার মনে হইল ইনিই কি তিনি অর্থাৎ পঞ্চকোটের তান্ত্রিকপ্রবর? ভাবিলাম আমার কি এতই সৌভাগ্য হইবে যে দূরের গঙ্গা ঘরের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইবে! পরিচয় আরম্ভ করিব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময়ে লোকটি নিজেই আমার কাছে আসিয়া শুধাইল, মশায়ের নাম?

নাম-ধাম বলিলাম।

—এখানে কি জন্যে?

সবিস্তারে বলিলাম, আশা ছিল ইনি তিনি হইলে এখনি ধরা দিবেন।

সমস্ত শুনিয়া লোকটি বলিল—মশায়কে তো বালক বলে হয়। ভাবিলাম, বুদ্ধির কথা বলিতেছে নাকি?

আজ্ঞে না, আমার বয়স পঁচিশ।

—তবেই হ'ল, বালক আর কাকে বলে? সংসারে কে কে আছেন?

বলিলাম।

—বিবাহ করেননি দেখছি।

ঘটক নাকি!

—আমি বলি কি আপনি ঘরে ফিরে যান।

—কেন?

—ও-পথ বড় বিঘ্নসঙ্কুল।

পাহাড়ে পথে হয় তো বাঘ-ভালুকের কথা বলিতেছে। শুধাইলাম, বাঘ-ভলুক আছে?

—না, না, পাহাড়ের পথের কথা বলছি না। বলছি যে তান্ত্রিক সাধনার পথ বড় বিঘ্নসঙ্কুল।

—আপনাকেও যেন—

—হাঁ, আমি একজন তান্ত্রিক। মশায় সেই জন্যই তো আপনাকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি। ও পথে যাবেন না, সর্বনাশ হ'য়ে যাবে।

—কেন এমন বলছেন?

—তবে শুনুন। এ বানানো ঘটনা নয়, আমার নিজের জীবনে যা ঘটেছে, যে মহা সর্বনাশ হ'য়েছে তাই বলছি। এ কাহিনী শুনবার পরেও আপনার যদি এ পথে যাবার ইচ্ছা হয় যাবেন।

কৌতূহলের বশে বলিলাম, বলুন। তারপরে বেশ চাপিয়া বসিলাম। তিনিও আমার কম্বলের একান্তে বসিলেন। তখন অন্ধকার অনেকটা পাতলা হইয়া আসিয়াছে। দেখিলাম যে লোকটি অত্যন্ত কৃশ, মুখের মধ্যে একটিও দাঁত নাই, নাক ও চোখ দুটিকে বাদ দিলে মুখমণ্ডলের আগাগোড়াই

সারি সারি বলি চিহ্নে পূর্ণ। আর এমন উদ্ধত নাসা ও উজ্জ্বল চোখ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। হুঁকো-কল্কে সযত্নে মাটিতে রক্ষা করিয়া লোকটি আরম্ভ করিল ঃ

মানভূম-বাঁকুড়ার যেখানেই যান না কেন মহানন্দ ঠাকুরের নাম শুনতে পাবেন। আমারই নাম মহানন্দ ঠাকুর। আমরা তান্ত্রিক বংশ। বাল্যকালে পিতার কাছে শাস্ত্র পাঠ করেছিলাম, তারপরে শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মও শিখেছিলাম তাঁর কাছে। তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মের আয়ে আমাদের সাংসারিক স্বচ্ছলতা ছিল, ঐ করেই পিতা কিছু জমি-জমাও কিনেছিলেন। তারপরে তিনি গত হ'লে আমিও ঐভাবে সংসার চালাতে লাগলাম। যথাসময়ে বিবাহ করলাম এবং ক্রমে সন্তানাদিও হ'ল। ইতিমধ্যে একজন অভিজ্ঞ ক্রিয়াবান তান্ত্রিক বলে দেশের মধ্যে আমার নাম ছড়িয়ে পড়লো। ক্রমে অন্য জেলা থেকেও শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করবার জন্যে ডাক আসতে লাগলো। এমন কি কখনো কখনো ধনী ব্যক্তিদের আগ্রহে কল্‌কাতায় তাঁদের বাড়ীতে গিয়েও ক্রিয়াকর্ম করতে হ'য়েছে। দুইজন উপযুক্ত চেলাও জুটে গিয়েছিল। যাক্, ও-সমস্ত কাহিনী এখন থাক।

—কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আপনি আমাকে নিষেধ করছেন কেন? আপনার যদি এত বাড়বাড়ন্ত হ'য়ে থাকে, আমারই বা হবে না কেন?

—অতি বাড় ভালো নয় বাবা, ওতেই তো পতন হ'ল। সেই ঘটনাই বলতে বসেছি, বাড়বাড়ন্তের কথা নয়।

এখন আমার বয়স ষষ্টি পূর্ণ হ'য়েছে। প্রায় কুড়ি বৎসর

আগেকার কথা বলছি। সেদিনের কথা বেশ মনে আছে। ভোরবেলা উঠে দাওয়ায় ব'সে তামাক খাচ্ছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হ'লেন। তিনি জানালেন যে তাঁর মনিবের বাড়ীতে একটা স্বস্ত্যয়ন করতে হ'বে, আমার নাম তাঁর মনিব এক ধনী বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছেন, আমাকে কল্‌-কাতায় যেতে হবে।

আপত্তি করবার কিছু ছিল না, একদিকে প্রচুর অর্থ পাবার আশা, অন্যদিকে অজন্মার জন্য সে-বছর খরচের টানাটানি।

গৃহিণী শুনে বললেন, যাও না, তবে তাড়াতাড়ি ফিরো।

ছেলে ছুটি এবং মেয়ে তিনটি কলকাতা যাচ্ছি শুনে কার কি চাই একটা ফর্দ ক'রে আমার হাতে দিলে। মহেন্দ্র আর অনাদি নামে ছু'ইজন চেলাকে নিয়ে সেদিন রাত্রে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কল্‌কাতা যাত্রা করলাম।

কল্‌কাতায় এসে ঐ ভদ্রলোকের মনিবের সঙ্গে আলাপ হ'ল। যেমন ধনী, তেমনি সজ্জন, বয়স যাটের উপরে, নাম যত্নপতিবাবু।

যত্নপতিবাবু বললেন যে বছর দশেক আগে তিনি গিরিডিতে একটি বাড়ী কিনেছিলেন। বাড়ীটি কিনবার পর থেকেই তাঁর পরিবারে ঘন ঘন মৃত্যু হ'তে আরম্ভ করলো।

আমি শুধোলাম গিরিডির বাড়ী ক্রয়ের সঙ্গে মৃত্যুর যোগাযোগ বুঝলেন কি ক'রে?

তিনি বল্‌লেন, প্রথমে তো বুঝতে পারিনি, ক্রমে পেরেছি।

—কেমন ক'রে?

—সব বলছি শুনুন।

—আচ্ছা, মৃত্যু কি গিরিডির বাড়ীতে হ'য়েছে?

—না, সমস্ত মৃত্যুই কল্‌কাতায় ঘটেছে।

—মৃতেরা কি কখনো গিরিডির বাড়ীতে গিয়েছিলেন?

—ছুটি-ছাটায় দু'দশ দিনের জন্য গিয়েছে। স্থায়ীভাবে কখনো থাকেনি।

—স্থায়ীভাবে কে থাকেন ওখানে?

—স্থায়ীভাবে বলতে গেলে থাকি আমি আর আমার স্ত্রী। আমরা স্বামী-স্ত্রী স্থায়ীভাবে ওখানে থাকবার উদ্দেশ্যেই বাড়ীটা কিনি, আর কিনে দুটো নূতন মহল তৈরী ক'রে নিই। কিন্তু—

বলে তিনি কপালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে ব'সে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, প্রথমে গেলেন আমার ভাই আর ভ্রাতৃবধূ। আমরা একান্নভুক্ত ছিলাম। তারপরে আমার অবিবাহিতা কন্যা দুটি গেল। তারপরে গেলেন পুত্রবধূ, তারপরে পুত্র, ঐ একটিই ছিল আমার।

—এখন আপনাদের সংসারে কে কে আছেন?

—আমি, গৃহিণী আর একটি নাতি—ঐ পুত্রটির পুত্র।

—আচ্ছা এবারে বলুন, ঐ বাড়ী কেনা আর মৃত্যুর মধ্যে যোগাযোগের সন্দেহ কেন হ'ল?

—সবগুলি মৃত্যুই অবশ্য রোগে হ'য়েছে, কাজেই সন্দেহ করবার কারণ হয়নি। কিন্তু শেষ দু'জনের অর্থাৎ আমার পুত্রবধূর ও পুত্রের মৃত্যুর আগে, রোগে পড়া আর মৃত্যুর মধ্যে বেশী সময় পাওয়া যায় না, একবার ক'রে মহাপুরুষ সাক্ষাৎ

দিয়েছেন।

—মহাপুরুষ ?

—হাঁ।

—কোথায় ?

—গিরিডির বাড়ীতে। বোধ করি বাড়ীটা তাঁর আশ্রয়, আমরা কেনাতে তিনি বিরক্ত হ'য়েছেন।

—বাড়ীটা বেচে দেন না কেন ?

—বেচবার চেষ্টা করেছি, কেউ কেনে না। দান করবার চেষ্টা করেছি, কেউ নেয় না। আমার দুর্ভাগ্যের সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে গিয়েছে কিনা। কি বলবো ঠাকুর, বাড়ীটা আঠার মতো আমার হাতে আটকে থেকে আমার সর্বনাশ করছে। এখন শিবরাত্রির সলতে ঐ নাতিটি মাত্র আছে—তাকে বাঁচাও ঠাকুর।

এই বলে তিনি আমার পা জড়িয়ে ধরলেন।

আমি বললাম—করেন কি, করেন কি, ওতে যে আমার পাপ হবে।

আরও বল্‌লাম, মহাপুরুষকে খুব শক্তিশালী মনে হচ্ছে, তাই কাজটি খুব শক্ত, খরচ-পত্র হবে।

—হোক্, হোক্, আপনি আয়োজন করুন।

তারপর দিন-পনেরো কলকাতার বাজারে এবং নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে স্বস্ত্যয়নের সমস্ত উপকরণাদি সংগ্রহ করলাম, টাকার অভাব ছিল না, তাই কোন ত্রুটি রাখলাম না।

সমস্ত সংগ্রহ শেষ হ'লে যদুপতিবাবুকে বললাম, এবারে আমাদের গিরিডি যাত্রা করতে হবে, সঙ্গে আপনি আর আপনার

স্ত্রী যাবেন।

— নাতিটি ?

—সে এখানে থাকবে।

তারপরে একদিন নাতিটির বুকে শাস্ত্রোক্ত একটি কবচ পরিয়ে দিয়ে আমরা সকলে গিরিডি যাত্রা করলাম।

মহানন্দ ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—

সন্ধ্যার আগেই আমরা গিরিডিতে এসে পৌঁছলাম। যদুপতিবাবুর মস্ত বাড়ী। তিনি আমাদের তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীটা দেখালেন। একটা পুরাতন মহল। যদুপতিবাবু বললেন, এটা তিনি কিনেছিলেন, আর দুটো মহল তৈরী করেছেন—নূতন ও পুরাতন মহলের মস্ত একটা উঠোন, অনেক রকম ফুল গাছ— আর মস্ত একটা বেল গাছ।

আমাদের থাকবার জায়গা পুরানো মহলটার নীচের ঘরে হ'ল। আমরা সেখানে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে যদুপতিবাবু এলেন। তখন আবার স্বস্ত্যয়নের কথাবার্তা সুরু হ'ল—বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। এমন সময় একজন বুড়ো লোক খড়ম পায়ে দিয়ে বিনা নোটিশে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন, তাঁর গা খালি, খাটো ধুতি পরনে, কাঁধের উপর একখানি গামছা, তিনি সরাসরি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা এখানে কেন এসেছ ?

আমি কারণ বললাম।

তিনি বললেন—পারবে ?

—চেষ্টা করে দেখি।

—আচ্ছা, দেখো।

তারপরে মহেন্দ্র ও অনাদির দিকে তাকিয়ে শুধালেন—তোমরা এর মধ্যে কেন ? মারা পড়বে যে !

মহেন্দ্র বলল—এই ত আমাদের পেশা !

—পেশা ? বটে ! এখনি পালাও, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

তারপরে তিনি অনাদির দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন বাপু মারা পড়বে ! তোমার বাড়ী রাণীপুকুরে, কি বলো ?

—আজ্ঞা হাঁ।

আবার মহেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তোমার বাড়ী বামুনদাঁড়া গাঁয়ে ? এখনি সরে পড়ো।

আর আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, দুটো বামুনের ছেলে মারবার জন্যে নিয়ে এসেছ ? তোমার আর কি ? আচ্ছা, দেখা যাবে কেমন স্বস্ত্যয়ন করতে পারো ?

এই বলে আবার বিনা নোটিশে যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন।

আমি ভাবলাম লোকটা পাড়ার কোন মাথা-পাগলা বুড়ো হবে, যারা সব কাজে বিনা প্রার্থনায় উপদেশ দিয়ে থাকে। যদু-পতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—লোকটা কে ? কিন্তু দেখি যে তিনি কাঠের পুতুলের মতো তাঁর প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে নিষ্পলক-ভাবে বসে আছেন ! আবার শুধোলাম—মশায় লোকটা কে ?

যত্নপতিবাবু শুষ্ককণ্ঠে বললেন—ইনিই তিনি।

—কে ?

—সেই মহাপুরুষ—যাঁর কথা আপনাকে পরে বলবো বলেছিলাম।

—চিনলেন কি করে ?

আমার পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত্যুর আগে দু'বার দেখা দিয়েছিলেন ?

—কোথায় ?

—ঠিক এই ঘরে—এই রকম সন্ধ্যাবেলায়।

এবার মহানন্দ ঠাকুর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—মশায়, আমি অনেক ভূত, প্রেত, ব্রহ্মদৈত্য দেখেছি—কিন্তু ঠিক এ-রকম প্রত্যক্ষভাবে কিছু দেখিনি। মহাপুরুষ যিনিই হোন, এরকম শক্তিশালী ব্রহ্মদৈত্য আগে দেখিনি, বুঝলাম এবার খুব কঠিন পরীক্ষার সম্মুখে এসেছি।

অনাদি বেঁকে বসলো, বললো—মশায়, আমি এর মধ্যে নেই। দেখলেন না উনি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ?

—আহা, তোমার ভয় কি ?

—ভরসাই বা কি ? না মশায়, ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। আমি এর মধ্যে নেই।

আমি বললাম—তোমরা নিশ্চয় জেনো, ক্ষতি হলে আমার হবে। তোমরা আমার সঙ্গে এসেছ, তোমাদের দোষ কি ?

—কই, আপনাকে তো কিছু বললেন না ?

—আমাকে কৃতনিশ্চয় জেনেছেন, তাই বলা বাহুল্য মনে

করলেন। কিন্তু অনাদি কিছুতেই রাজী হ'ল না, অবশ্য মহেন্দ্র বলল যে সে আমায় সাহায্য করবে, ক্ষতি হলে আর কি করা যায় ?

পরদিন সন্ধ্যাবেলা পুরাতন মহলের প্রশস্ত একটি কক্ষে আমরা অর্থাৎ আমি ও মহেন্দ্র স্বস্ত্যয়নে বসলাম। যদুপতিবাবু আর তাঁর গৃহিণী দু'জনে একদিকে বসলেন। সারারাত্রি স্বস্ত্যয়ন চলবে—শেষ রাত্রে পূর্ণাহুতি। এমন তিন রাত্রি চলবে।

প্রথম রাত্রে আর কোন বাধা সৃষ্টি হ'ল না, কেবল পাশের ঘরে সারারাত্রি একজোড়া খড়মের খট খট শব্দ উঠ্‌তে লাগলো, যেন কে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। কে বেড়াচ্ছে সবাই বুঝতে পারলো। শেষ রাত্রে যথারীতি পূর্ণাহুতি হয়ে গেল। দ্বিতীয় রাত্রির স্বস্ত্যয়নও অনুরূপ অবস্থায় সম্পন্ন হ'য়ে গেল। তৃতীয় দিন রাত্রে আবার যথাসময়ে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হ'ল। আজকে অনাদি কি ভেবে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে। এ ঘরে স্বস্ত্যয়ন চলছে—আর পাশের ঘরে খড়মের সেই পায়চারির শব্দ !

স্বস্ত্যয়ন শেষ করে পূর্ণাহুতি দেবার আয়োজন করছি, এমন সময়ে অদূরে এক বিকট শব্দ শ্রুত হ'ল। প্রাচীনকালে ডাকাতরা যেমন আওয়াজ ক'রে বাড়ীর উপর চড়াও হ'ত—সেই রকম শব্দ। শব্দ ক্রমে নিকটতর হতে লাগলো। যদুপতিবাবু ও তাঁর গৃহিণী ভয়ে তটস্থ, মহেন্দ্র আর অনাদিরও প্রায় সেই অবস্থা। আমি অভয় দিয়ে বললাম, যা-ই দেখুন না কেন, আপনারা ভয় পাবেন না বা আসন ত্যাগ করবেন না, তা হ'লেই বিপদ ঘটবে।

শব্দ এবারে বাড়ীর কাছে এসে পৌঁচেছে। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই চারজন বিরাটকায় পুরুষ ঘরে প্রবেশ করলো। তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কেবল পায়ে খড়ম আর গলায় আর বাহুতে রুদ্রাক্ষের ডোর—আর প্রত্যেকের হাতে প্রকাণ্ড একটি নরকপাল।

তারা আমার কাছে এসে নরকপাল পেতে দাঁড়ালো। আমি নরকপাল পূর্ণ ক'রে কারণ-বারি ভ'রে দিতে লাগলাম। প্রচুর কারণ-বারির আয়োজন ছিল, যদুপতিবাবু খরচের কার্পণ্য করেননি। তারা প্রত্যেকে আট দশ বার বারি পান ক'রে সেই রকম বিকট ধ্বনি করতে করতে প্রস্থান করলো।

ওরা আসবার আগেই পূর্ণাহুতি দান হ'য়ে গিয়েছিলো। কান পেতে শুনলাম পাশের ঘরে খড়মের আওয়াজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। মনটা খুশী হ'ল।

পরদিন ভোরবেলা আমি যদুপতিবাবুকে বললাম, আপনাদের বিঘ্ন কেটে গেল।

তিনি শুধোলেন, বুঝলেন কি ভাবে?

—ঐ যে ওঁরা এসে কারণ-বারি পান করলেন, ওটাই সার্থক স্বস্ত্যয়নের চিহ্ন।

—ওঁরা কে? প্রেতযোনি?

—না, ওঁরা ভৈরব। বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে থাকেন, তান্ত্রিক ক্রিয়ার সংবাদ পেলে আসেন।

—সংবাদ পাবেন কি ক'রে?

—তা নইলে আর ভৈরব কেন? মন্ত্রশক্তির ফলে ওঁরা

জানতে পারেন।

—কিন্তু কাছাকাছি তো কোথাও পাহাড়-পর্বত নেই।

—কেন হিমালয়?

যদুপতিবাবু ভাবলেন যে আমি পরিহাস করছি।

—পরিহাস নয়। সাধনার বলে ওরা মনোরথ গতি লাভ করেছেন। যেমন অনায়াসে দূরের সংবাদ জানতে পারেন, তেমনি মনোরথ বেগে চলাচল করতে পারেন।

—কই, স্বস্ত্যয়নের সফলতা সম্বন্ধে ওঁরা কিছু বললেন না তো?

—ওঁরা যার-তার সঙ্গে কথা বলেন না। কিন্তু ওঁরা যে এলেন আর কারণ-বারি পান ক'রে সন্তুষ্ট হ'লেন, এ থেকেই বুঝে নিতে হবে।

—সন্তুষ্ট না হ'লে?

—সর্বনাশ! তৃপ্তিমতো কারণ-বারি না পেলে সমস্ত লণ্ডভণ্ড ক'রে দিতেন, কাউকে আর জীবিত থাকতে হ'ত না।

তারপর বললাম, যাক্, আপনি নিশ্চিন্তে এবার এ বাড়ীতে বাস করুন, আপনার নাতির সমস্ত ফাঁড়া কেটে গেল।

পরে, অনেকদিন পরে, যদুপতিবাবুর কাছ থেকে তাঁর নাতির বিবাহের নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। এতদিনে বোধহয় যদুপতিবাবু গত হ'য়েছেন, এসব অনেকদিনের কথা হ'ল।

সেইদিনেই আমরা তিনজনে বাঁকুড়া অভিমুখে যাত্রা করলাম। মহেন্দ্র আর অনাদি কলকাতা হ'য়ে গেল, আমি ভোর রাত্রের ট্রেনে ঝাঁটিপাহাড় স্টেশনে এসে নামলাম। আগেই

লিখে দিয়েছিলাম স্টেশনে যেন একজন লোক আর গোরুর গাড়ী আসে। স্টেশনের বাইরে এসে দেখি আমার পুরানো চাকর গোবিন্দ দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই সে ডুকরে কেঁদে পায়ের উপর পড়লো, কর্তা, আর কি করতে বাড়ী যাবেন?

বুঝলাম, মহাপুরুষ আমার সর্বনাশ না ক'রে ছাড়েননি। শুনলাম দু'দিন আগে স্বস্ত্যয়নের শেষরাত্রে আমার স্ত্রী-পুত্র সব ওলাউঠায় মারা গিয়েছে।

তখনি ফিরলাম, বাড়ী আর গেলাম না। মহাপুরুষকে গৃহছাড়া ক'রেছিলাম, তিনিও আমাকে গৃহছাড়া ক'রে তবে ছাড়লেন। সেই থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়াই—এমনি ক'রে কুড়ি বছর হয়ে গেল। আরও কতদিন ঘুরে বেড়াতে হবে কে জানে!

মহানন্দ ঠাকুর থামিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তামাক সাজিয়া লইলেন এবং তাহা যথারীতি সেবন করিতে করিতে বলিলেন, তাই বলছিলাম বাবা, ও-পথে যেও না। ও সকলের সয় না। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ যারা ক'রে থাকে, তাদের প্রায় সকলেরই আমার মতো দশা হ'য়ে থাকে। তোমার এখনো ফিরবার পথ আছে, ফিরে যাও, বুড়োর কথা শোনো।

ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। প্রথমতঃ মহাপুরুষ ও ভৈরব দেখিবার তেমন আগ্রহ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ সংসারে এডভেঞ্চারের পথ তো একটি মাত্র নয়, পথান্তর বাছিয়া লইলেই চলিতে পারে। বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। এখন এডভেঞ্চারের নূতন পথ ধরিয়াছি—পাঠ্যপুস্তক লিখিতেছি

এবং নিত্যনূতন মহাপুরুষের পরিচয় পাইতেছি। আরও দেখিতেছি যে এ পথের ভৈরবগণও নরকপাল পূর্ণ করিয়া কারণ-বারি না পাইলে এমন সব লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করে যে সে কি আর বলিব!

স্বপ্নাপ্ত কাহিনী

প্রিয় যতীন,

তুমি লিখেছ তুমি যুক্তিপন্থী জীব, যতটুকু বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য, ততটুকু মাত্র বিশ্বাস করো। অর্থাৎ তোমার বিশ্ব বুদ্ধির বিশ্ব। এ বিষয়ে তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছ। অল্প বয়সে চ্যালেঞ্জ করা এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা শোভা পায়। কিন্তু আমি যে বয়সে পৌঁচেছি, তাতে চ্যালেঞ্জ করা দূরে থাকুক, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করাও অশোভন। তুমি আমাকে বুদ্ধিবিশ্বের অন্যথা প্রমাণ করতে অনুরোধ করেছ। কিন্তু যা প্রমাণ করবার নয়, তা কি ক'রে প্রমাণ করবো?

বিশ্বের মাঝখানটাতে বুদ্ধির আলো ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে প্রমাণের মাপকাঠি চলে, কিন্তু তার বাইরেটায় আলো-আঁধার ভাব, সেখানে ও মাপকাঠি অচল, তাকে বলি আমি বিশ্বাসের

বিশ্ব! যুক্তি যেমন মনের একটা গুণ, বিশ্বাসও তেমনি আর একটা গুণ, ভুলো না। বুদ্ধি চিত্তবৃত্তির চোখ, আর বিশ্বাস হৃদয়ের চোখ।

জগতে যা-কিছু মূলগত তারই প্রমাণ নেই, সমস্ত জ্যামিতি শাস্ত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রমাণাতীত কয়েকটি বিশ্বাসের বাসুকি শীর্ষে। একথা বয়সে বোঝা যায়, তোমার এখনো সে বয়স হয়নি।

তোমার বিশেষ আক্রোশ দেখছি ভূত আর ভগবানের উপরে। ভগবানকে এক রকম ক্ষমা-ঘেন্না ক'রে ছেড়ে দিয়েছ, কিন্তু ভূতের অবিশ্বাস্যতা সম্বন্ধে তুমি নাছোড়বান্দা। ভগবানকে যে অল্পে ছেড়ে দিয়েছ, তার কারণ তোমার অবচেতন সংস্কার। কিন্তু কে বলল ভগবান ভূতের চেয়ে বেশী বিশ্বাসযোগ্য। ভগবান মানলে ভূত মানতে হবেই। ও-দুটি একই বিশ্বাসের এপিঠ-ওপিঠ। নাস্তিকের কাছে ভূত ও ভগবান দুই-ই সমান অবিশ্বাস্য। আমি ভগবান ও ভূত দুই-ই মানি। তুমি বলেছ যে, তুমি ভগবান মানো, কিন্তু ভূত যে মানো তা তুমি নিজেও জানো না। আমি যতদূর বুঝি তুমি ভূত মানতে চাও, কেউ যদি মানিয়ে দেয়—তবেই।

ভূত এবং ভগবান দুই-ই প্রমাণাতীত ও বিশ্বাসগ্রাহ্য। যে ব্যক্তি ভগবানে অবিশ্বাসী তার পক্ষে সত্যই ভগবান নেই। ভূত সম্বন্ধেও সেই কথা। তবে প্রভেদের মধ্যে এই, ভূত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভগবদ্ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের চেয়ে অনেক ব্যাপক। কোন রকম তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করে একটি ঘটনার উল্লেখ করব,

ভগবান সম্বন্ধে নয়, ভূত সম্বন্ধে। বিশ্বাস করতে হয় করো, না হয় করো না, তবে একটি অনুরোধ এই পত্রে, যা লিখলাম তার বেশী ব্যাখ্যা আমার কাছে প্রত্যাশা করো না, কারণ ব্যাখ্যা আমিও পাইনি, বোধ করি পাওয়া সম্ভবও নয়।

এবারে আরম্ভ করি।

জাপানী বোমা পতনের আশঙ্কার কথা মনে পড়ে কি? কল্‌কাতার লোক বোঁচকা-বুঁচকি, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে যে যেদিকে পারে, দিকবিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে। দূরে যাওয়া যার সম্ভব নয়, সে পাড়া পরিবর্তন করে নিরাপত্তার আশ্বাস অনুভব করছে। টালার লোকে টালিগঞ্জে এসে ভাবছে নিরাপদ, আবার বালিগঞ্জের লোকে বাগবাজারে এসে ভাবছে যাক্ বাঁচা গেল। তাদের দোষ দিইনে, কারণ আকাশ থেকে বোমা পড়লে যে কি রকম অবস্থার উদ্ভব হতে পারে, সে সম্বন্ধে ক্ষীণতম ধারণাও কারুর ছিল না।

আমরা তিন বন্ধু একই অফিসে পাশাপাশি টেবিলে বসে কাজ করি। আমরা স্থির করলাম যে, কল্‌কাতাতেই থাকবো, কেননা কল্‌কাতার বিপদ অনিশ্চিত, বাইরে গেলে বিপদ প্রায় সুনিশ্চিত। তারপরে আমরা থাকবো কল্‌কাতায়, দূরদেশে স্ত্রী-পুত্র থাকবে কার হেফাজতে? এই রকম নানা চিন্তা করে থেকে যাওয়াই স্থির করলাম।

কিন্তু সংসারে এত লোক যে আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন তা কে জানতো? যার সঙ্গে দেখা হয়, জিজ্ঞাসা করে—ফ্যামিলি কোথায়?

—এখানেই।

—কি সর্বনাশ। এখনো ?

কেউ কেউ আবার বিস্তৃত বিবরণ দেয়—একবার বোমা পড়লে কি আর কিছু থাকবে ? সব যে জ্বলে-পুড়ে যাবে। তাঁর মাসশ্বশুর নাকি রেঙ্গুণে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন !

আবার কেউ বা সহানুভূতির সঙ্গে চোখ টিপে ইশারা নিক্ষেপ করে, বলে, বোমা-টোমা কিছু নয়, মিলিটারীর জন্যে কল্‌কাতা শহর খালি করবার একটা চাল।

এ নাকি একেবারে খাস ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সংবাদ।

বাইরে যেমন তেমন, অন্দরমহলের তরঙ্গ দুনিবার। পাশের বাড়ীর মহিলারা সেজেগুজে বাক্স-প্যাঁটরা সাজিয়ে এসে জানিয়ে যান—ওমা, তোমরা এখনো তৈরী হওনি ! কি বললে, তোমরা কল্‌কাতাতেই থাকবে ! বিস্ময়ে তাঁদের আর বাক্‌স্ফূর্তি হয় না, তাঁরা গালে হাত দিয়ে প্রস্থান করেন। আবার আর এক পাশের বাড়ীর মেয়েরা জানিয়ে যায়, শীগ্‌গীর রওনা হয়ে পড়।

—কিঁ, অফিসে ছুটি দেবে না ? কে বল্‌লে ? আমার দাদা সরকারী অফিসের বড়সাহেব, তিনি বলেছেন, চাইবামাত্র ছুটি দেবার হুকুম এসেছে।

এইভাবে ভিতর বাহিরের তাগিদে আমাদের তিন বন্ধুর প্রাণান্ত হওয়ার উপক্রম। কারুর স্ত্রীর মুখ ভার, কারুর ছেলে-মেয়ে কাঁদো কাঁদো, আর কারুর বা বহুদিনের ঝি-চাকর ছাড়ো ছাড়ো, কাজেই তখন তিনজনে বাইরে যাওয়ার পরামর্শ স্থুরু করতে বাধ্য হলাম। বেচারী কাণ্ডজ্ঞান ক্ষীণপ্রাণ, এমন সাঁড়াশি

আক্রমণের সম্মুখে কতক্ষণ টিকতে পারে।

অনেক শলা-পরামর্শ করে তিনজনে যা স্থির করলাম তার মর্ম এইরূপ। আমাদের সিদ্ধান্ত হ'ল যে, ও-রকমভাবে দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে অজ্ঞাতস্থানে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ছুটে গিয়ে কোন লাভ নেই। তার আগে বরঞ্চ নিজেরা গিয়ে একবার দেখে-শুনে আসা ভালো, দু'দিন দেরি হয় হোক, তবু কাজ পাকা হবে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হ'ল, তিনজনের পরিবারবর্গই একস্থানে এবং এক বাড়ীতে থাকবে। তার সুবিধে হবে এই যে, পালাক্রমে একজন করে ছুটি নিলেই বিদেশে তিনজনের পরিবারেরই রক্ষণাবেক্ষণ করা চলবে। তৃতীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, স্থান নির্বাচনের সময়ে তিনজনেই যাবো, কারণ 'চাইবা মাত্র' ছুটি দেওয়ার হুকুম যখন এসেছে তখন আর বাধা কি ?

এই সিদ্ধান্ত ও সঙ্কল্পের পরে একদিন তিন বন্ধুতে রওনা হলাম এবং যথাসময়ে আমাদের উদ্দিষ্ট পশ্চিমের এক শহরে এসে উপস্থিত হলাম। শহরের নামটি গোপন রাখছি, কেন রাখছি তা সহজেই বুঝতে পারবে। ঘণ্টা কয়েক ঘোরাঘুরির পরে পছন্দমতো একটি বাড়ী পেলাম। বাড়ীটা পুরানো, লোকে বলে নবাবী আমলের। তা হয় হোক্, আমাদের যে সঙ্কট তাতে মান্ধাতার আমলের বাড়ীও অচল হবার কথা নয়। ভাড়াটাও আমাদের সাধ্যের মধ্যে, অতএব স্থির হ'ল যে, পরদিন আগাম ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে রসিদ নেবো। বাড়ীর মালিক সদাশয়, তিনি বললেন, সে কথা ঠিক বাবুজি! তা আজ রাতটা আপনারা এখানেই থাকুন। সে রাত্রি আমরা তিনজনে

ঐ বাড়ীতে কাটানোই স্থির করলাম।

(২)

অদূরবর্তী বাজার থেকে তিনজনে কিছু খেয়ে নিলাম এবং আসবার সময়ে গোটা দুই মোমবাতি কিনে আনলাম। তারপরে ফিরে এসে শোবার ব্যবস্থা করলাম। বাড়ীটার মাঝখানে একটা হলঘর ছিল, বেশ বড় রকম, খান দুই তক্তোপোশও ছিল, তারই উপরে বিছানা পেতে তিনজনে শুয়ে পড়লাম। আমার জায়গা এক পাশে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা দুইজন ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু আমার ঘুম আর আসে না। শীতের প্রখরতাতেই হোক্, আর নূতন স্থানের অস্বস্তিতেই হোক্, কিছুতেই যখন ঘুম এলো না তখন অগত্যা জেগেই শুয়ে রইলাম। আমি যেদিকে শুয়েছি, তার অদূরে ঘরের একটা দেয়াল, সেই দেয়ালের দিকে তাকিয়ে মাথা-মুণ্ডু পূর্বাপর কত কি চিন্তা করতে লাগলাম। রাত তখন কত জানি না, মনে হ'ল দেয়ালের গায়ে জোনাকি পোকার মতো কি একটা জ্বলছে। ভাবলাম ঘরের মধ্যে জোনাকি পোকা এলো কোত্থেকে। কিছুক্ষণ পরে দেখি তার পাশে আর একটা জোনাকি পোকা! ভারি মজা তো! বোধ হয় জোনাকি-দম্পতি হবে। কিন্তু আমার তখনি বোঝা উচিত ছিল, জোনাকি পোকা নয়, কারণ উক্ত পোকা চঞ্চল আলো দেয়, এ আলো স্থির। একবার মনে হ'ল আর কিছু নয়, দেয়ালের বালুকণার উপরে আলো পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। কিন্তু আলো আসবে কোথা থেকে ?

ঘর তো অন্ধকার। বালিশের তলে 'টিপ-বাতি' ছিল, জ্বাললাম, কোথাও কিছু নেই, দেয়াল পরিষ্কার সাদা। আলো নেভাতেই আবার দেয়ালে আলো দুটো জ্বলে উঠল। ভাবলাম, পড়ে মরুকগে, আলোর মতো আলো জ্বলুক, আমার মতো আমি ঘুমোই। সত্যি কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। ঘুম ভাঙতেই দেয়ালে চোখ পড়লো এবং এবারে যা দেখলাম তাতে মাঘ মাসের রাত্রিতেও কপালে ঘাম দেখা দিল। দেখলাম যে ঐ আলোর বিন্দু দুটিকে যদি দুটি চোখ বলে কল্পনা করা যায়, তবে দেয়ালের গায়ে একটা নরকঙ্কাল যেন আভাসিত হয়ে উঠেছে। আলো দুটোর স্থান একটা মানুষের চোখের উচ্চতাতেই বটে! আবার ঐ আলো দুটোর আভাতেই কঙ্কালটা আভাসে প্রকাশ পাচ্ছিল। এমন অবস্থাতে চীৎকার করে ওঠাই স্বাভাবিক, কিন্তু চীৎকার করবার শক্তিও বোধ করি আমার লোপ পেয়েছিল। ভাবলাম, এ সবই হয়তো আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের বীভৎস কল্পনা। মনের একটা ভাগ যখন সন্দেহ করছিল, আর একটা ভাগ বিশ্বাস করছিল। আর তখনো এতখানি বিশ্লেষণশক্তি ছিল, যাতে বুঝছিলাম ঐ বিশ্বাস করবার ভাগটাই আয়তনে বড় হচ্ছে। আরও একটা কথা, ঐ যে চোখের দৃষ্টি ও-শুধু আলো মাত্র নয়, ও যেন ক্রোধের এবং হিংসার রশ্মি, বিচ্ছুরিত হচ্ছে কোন্ অজ্ঞের চৈতন্যকেন্দ্র থেকে, নিক্ষিপ্ত হয়েছে আমার মুখের উপরে। ওর নিশ্চয় একটা বিষাক্ত প্রভাব আছে, নইলে আমাকে অভিভূত করে ফেলেছে কিসে? এবারে মনে হ'ল ঐ কঙ্কাল ও দেয়ালটার মধ্যে খানিকটা ব্যবধান ঘটেছে। ও কি তবে

এগোচ্ছে? আমার দিকে? শুধু নরকঙ্কাল হলে বোধ করি আমাকে এমন ভীত করে তুলতো না; কিন্তু ঐ বিষাক্ত ক্লেদাক্ত হিংসার্ত দৃষ্টি! ওতে যেন কতকালের ক্ষুধা আর আক্রোশ, আর বীভৎসতা মিশ্রিত।

চোখ বন্ধ করলাম। কিন্তু কয়েক হাত দূরে ঐ সত্তা, এমন সময়ে চোখ বুজে থাকতেই বেশী সাহসের দরকার হয়। সাহসের সঞ্চয় আমার অনেকক্ষণ ফুরিয়ে এসেছিল, এখন চলছিল কেবল মৌলিক প্রাণশক্তির তাগিদেই।

সাহস গিয়েছে, চীৎকার করবার শক্তি গিয়েছে, এবার চৈতন্যও বুঝি যায়, সমস্ত শরীর মন কেমন যেন ঝিমিয়ে আসছে। অবশ্য তখনো ভাবছিলাম ওটা কি বা কে? কেন আমার দিকে আসছে? আমার সঙ্গে ওর কি সম্বন্ধ?

এবার দেয়াল ও কঙ্কালের ব্যবধান আরও বেড়েছে। অথচ এ পর্যন্ত কোন শব্দ করেনি, দৃষ্টিই যেন ওর ভাষা। আর সে কি ভাষা! বোধ করি আর দু'চার মিনিটও আমার চৈতন্য সক্রিয় থাকিতে পারবে না, তারপরে সম্পূর্ণ অভিভূত হ'য়ে পড়লে, ঐ হিংস্র শত্রু যে কি করবে জানি না! ক্লোরোফর্মের প্রভাবে জ্ঞান যেমন লোপ পায়, তন্দ্রা যেমন চৈতন্যকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে তেমনিতরো প্রতিক্রিয়া ঘটছে ওর প্রভাবে আমার সত্তার ওপরে। ওঃ তাই বলো, সঙ্গীদের জাগাবার ক্ষমতা ওর প্রভাবেই লোপ পেয়েছে। বনরেখাহীন দিগন্তে অস্তমান সূর্যের ক্রমঃক্ষীয়মান তোরণটি যেমন শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত অনায়াসে লক্ষ্য করা যায়, তেমনি লক্ষ্য করছি আমার বিলীয়মান

চৈতন্যকে। গেল, ডুবে গেল, এবার বিন্দুমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে, আর দেখা যাচ্ছে না—এবারে সব অন্ধকার।

(৩)

ভোরবেলা ঘুম ভাঙামাত্র দেয়ালের দিকে তাকালাম, কোথাও কিছু নেই, পরিষ্কার সাদা দেয়াল রাতের ভীত কল্পনাকে পরিহাস করছে। বন্ধুরা উঠেছে, চা তৈরী করেছে।

একজন বলল, ঘুমোচ্ছ দেখে ডাকিনি।

আমি উত্তর না দিয়ে চায়ের টেবিলে গিয়ে বসলাম।

এমন সময়ে বাড়ীওলা শেঠজি এসে উপস্থিত হলেন। শিষ্টাচারাদির পরে তিনি বল্লেন, তাহ'লে ভাড়ার টাকাটা দিয়ে ফেলে রসিদ নিলেই হয়।

কমল বলল, আপনি দশটার সময় আসবেন, আমরা এই মাত্র উঠলাম।

শেঠজি চলে গেলেন।

—ব্যাপার কি! ভাড়া চুকিয়ে দিলেই হ'ত।

কমল বলল, কাল এক বীভৎস স্বপ্ন দেখেছি। চার পাঁচজন লোক মিলে একটা লোককে খুন করছে। স্বপ্নটা এমন জীবন্ত, আর তা ছাড়া উহা সারা রাতের মধ্যে পাঁচ-ছ'বার দেখলাম!

— স্বপ্নের সে দায়িত্ব এ বাড়ীর উপর চাপাচ্ছ কেন?

—কি জানি! যে বাড়ীর মধ্যে লোকটাকে খুন করছিল তার সঙ্গে এ বাড়ীটার যেন মিল আছে।

তখন জগৎ বলল, তবে শোনো, আমিও একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি।

—কি ?

—কারা যেন একটা লোককে খুন করবার পরে একটা বাড়ীর দেয়ালের ইট খসিয়ে মৃত দেহটাকে সেখানে খাড়া ক'রে আবার ইট গেঁথে সমান ক'রে দিচ্ছে।

কমল বলে উঠল—এটা যেন আমার স্বপ্নেরই উপসংহার।

তখন আমি বললাম, না, উপসংহার বোধ করি আমার হাতে।

—কি রকম ?

—তবে শোনো। এই বলে রাতের ঘটনা বললাম। সবাই নীরবে শুনলো।

—সর্বনাশ। এ সত্য না স্বপ্ন ?

—আমার জ্ঞান-বুদ্ধি বিশ্বাসমতো সত্য।

—হয়তো এর মূলে কোন সত্য আছে, আর সেই জন্যই বাড়ী গছাবার জন্যে শেঠজী শীতের রাত্রির ভোর না হতেই এসে হাজির হয়েছিলেন।

যাক্, মোট কথা দাঁড়ালো এই যে, সে বাড়ীটা ভাড়া নেওয়া হ'ল না। আর তারপরে জাপানী বোমার ভয়ে আমাদের স্থানান্তর গ্রহণের যা ব্যবস্থা হলো, তা আজকার বক্তব্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর, অতএব সেসব কথা অপ্রকট রইলো।

যতীন, তুমি বলবে এতে অপ্রাকৃতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। হয়তো হয় না, কিন্তু আরও আছে, নতুবা ভরসা ক'রে বলতে উদ্যত হ'তাম না।

এ ঘটনা এক রকম ভুলেই গিয়েছিলাম, এমন সময়ে

সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদে সমস্ত আবার দ্বিগুণ স্মৃতিতে ফিরে এসে দেখা দিল। সংবাদটির পটভূমিকা হচ্ছে দেশ-খণ্ডন! দেশ খণ্ডিত হবার ফলে আর একবার জনপ্রবাহ নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটোছুটি সুরু ক'রেছে।

একদিন সকাল বেলায় বসে খবরের কাগজ পড়ছি, হঠাৎ নজরে পড়ল খবরের শিরোনামায় পশ্চিমের সেই শহরের নামটি। কৌতূহল অনুভব ক'রে পড়লাম, খবরটি এই রকম—

"রহস্যময় আবিষ্কার"

"যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত মির্জাপুর জেলার একটি শহরে গঙ্গা-তীরে অবস্থিত একটি বাড়ীর দেয়াল সংস্কার করিতে গেলে তন্মধ্য হইতে একটি দণ্ডায়মান নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়! এই সংবাদ পাইবামাত্র পুলিশের লোক ও কয়েকজন সংবাদপত্রসেবী সেখানে উপস্থিত হন। বাড়ীর মালিক বলিতেছেন যে, তিনি কুড়ি বৎসর আগে বাড়ীটি কিনিয়াছেন, তিনি ইহার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই অবগত নহেন। পুলিশের লোকের অনুমান কঙ্কালটি অনেক দিনের পুরাতন, ২০০।৩০০ বৎসরের কম হইবে না। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিতেছেন যে গোপনে কোন লোককে হত্যা করিয়া দেহটাকে দেয়ালের মধ্যে গাঁথিয়া ফেলিয়া সমস্ত কাণ্ডটি গোপন করা হইয়াছে। বাড়ীওলা বলিতেছে যে, কোন ভাড়াটিয়া বাড়ীটিতে ২।৩ রাত্রির বেশী থাকিতে পারে নাই, ভয় পাইয়া উঠিয়া গিয়াছে, সকলেই নাকি দেয়ালে প্রোথিত নর-কঙ্কালের বিভীষিকা দেখিত। মোট কথা, এই আবিষ্কারের ফলে শহরে

বিষম ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে।”

শহরের নাম দেখে, বাড়ীর বিবরণ পড়ে আমার আর সন্দেহ মাত্র রইলো না যে, এ বাড়ী আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সেই বাড়ীটাই বটে। তা ছাড়া আমাদের সে রাত্রের অভিজ্ঞতা আর নর-কঙ্কালের অস্তিত্ব এ দুয়ের মধ্যেও যেন যোগাযোগ রয়েছে।

ওহে যুক্তিবাদী যতীন, এখন সমস্তটার একটা বুদ্ধিগত ব্যাখ্যা দাও তো। তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি না, নিতান্ত বিমূঢ়চিত্তে তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি একটা ব্যাখ্যা দাও, তা হ'লে মন থেকে একটা অযথা ভার আপনি হাল্কা হয়ে যায়। আমি নিতান্ত জিজ্ঞাসুর মতো তোমার কাছে অগ্রসর হচ্ছি, চ্যালেঞ্জের পতাকা তুলে নয়। এখন তুমি আমার সংশয় মোচন করো।

সেদিনের আমার দুই সঙ্গীর স্বপ্ন যেন একই ঘটনাসূত্রের অনুবৃত্তি ; আর আমার অভিজ্ঞতা আমি বাস্তব বলেই মনে করি, তুমি হয়তো Hallucination মনে করো—সেটাও ওদের স্বপ্নের যেন পরবর্তী অংশ। আর এই স্বপ্ন ও বাস্তবের সঙ্গে জড়িত রয়েছে দেয়ালে নিহিত সেই নর-কঙ্কাল, যার অস্তিত্বের সন্দেহ-মাত্র তখন আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। এর বুদ্ধিগত ব্যাখ্যা কি? দেয়ালের কুক্ষিগত ঐ নর-কঙ্কাল আমার জাগ্রত বুদ্ধিকে আর ওদের স্বপ্নগত চৈতন্যকে কিভাবে প্রভাবিত করলো? জানলে না-হয় এক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া চলে, কিন্তু না জানলে? আর অন্যান্য ভাড়াটাদের উপরেও তো একই রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে জানলে। তবে কি এই ধারণা করবো যে মৃত্যু হওয়া মাত্রই সব শেষ হ'য়ে যায় না, বাসা ভেঙ্গে দিলে পাখী-

গুলো যেমন অবোধ আশ্বাসে কিছুক্ষণ সেখানকার আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায়, তেমনি মানুষের অতৃপ্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা আশা-আকাঙ্ক্ষাও কি মানবজন্মের ক্ষেত্রে কিছুদিন সজীব আর সক্রিয় থাকে? আর যদিই বা তা থাকে, সেই বিদেহী সত্তা অপর দেহকে প্রভাবিত করে কোন মাধ্যমে? আশা করি পত্রোত্তরে এসব দুরূহ সমস্যার একটা ব্যাখ্যা করে দিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করবে। আর একটি অনুরোধ, রাত্রিবেলা এক নির্জন ঘরে স্তিমিত দীপালোকে এই চিঠিখানি পড়বার সময়ে যে মনোভাব হয়, অকপটে তা আমাকে জানাতে ভুলো না। ইতি

ব্যাকুলভাবে অপেক্ষমান

অরিন্দম।

সতীন

॥ স্বামীর পত্র ॥

কমল,

অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে বড় ভালো লাগলো। এতদিন তোমার পক্ষে চিঠি লেখা সহজ ছিল না, তুমি দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছিলে। অবশ্য, আমি তোমার খবর মাঝে মাঝে পেয়েছি, কখনো কখনো তোমার সহকর্মীদের মুখে, কখনো বা বৈদেশিক সংবাদের স্তম্ভে। আমি জানতাম যে, তুমি ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় রওনা হয়ে গিয়েছ, তারপরে অনেক দিন আর খবর পাইনি। মাসখানেক আগে সংবাদপত্রে দেখেছিলাম যে তুমি শীঘ্র এসে পৌঁছবে; এসে পৌঁচেছ, জানতে পারলাম তোমার চিঠি পেয়ে।

চিঠিতে যে বিষয়টি জানবার ইচ্ছা সসঙ্কোচে প্রকাশ করেছ, তা খুবই স্বাভাবিক, কেননা তুমি আমার ও আমাদের সম্বন্ধের স্বরূপ যেমন জানতে এমন আর কে? আমার বেশ মনে পড়ছে তোমার সেই মুখ। তুমি অরুন্ধতীর শেষ শয্যার পাশে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছ, ডাক্তার বিদায় হয়ে গিয়েছে, অরুন্ধতী সমস্ত বুঝতে পেরেছে, তার মনে কোন সংশয় নেই; সে তোমাকে মিনতি জানালো, কমলবাবু, ওঁকে অনুরোধ করুন আবার যেন উনি বিবাহ করেন। প্রথমটা তুমি উত্তর করোনি, কিন্তু শেষে

বললে, যা হবার নয়, সে অনুরোধ করবেন না, আমি ওকে বেশ জানি। তোমার কথা শুনে অরুন্ধতীর মুখে স্বস্তিমিশ্রিত একটা আশার ভাব ফুটে উঠল। হায়রে, অন্তিম-পথযাত্রীরও আশা থাকে নাকি! কিসের আশা? প্রিয়জনের স্মরণে বেঁচে থাকবার আশা? হয়তো বা তাই।

তার পরের ঘটনা বিবৃত ক'রে লাভ নেই। সবই জানো। শূন্য গৃহ দুঃসহ হয়ে উঠল। তোমার ঘরেই ছ'মাস সঙ্গ দিয়ে আমাকে রেখেছিলে, বোধ করি প্রাণটাই বাঁচিয়ে দিয়েছিলে। তার পরে মন একটু সুস্থ হয়ে উঠলে স্বগৃহে ফিরে এলাম। গৃহ শূন্য হলেও পূর্ণ; শূন্য গৃহ বলে আগে বোধ হয় ভুল করেছি; দুঃখের স্মৃতিও একটা অস্তিত্ব, সেও একরকম পূর্ণতা। কিছুদিন পরে সরকারী তল্পি বহন করে তুমি দেশান্তরে গেলে। তখন থেকে তোমার-আমার জানাশোনার জাল ছিন্ন।

ভেবেছিলাম, তুমি কলকাতায় ফিরে এলে সব নিজমুখে বর্ণনা করবো, আশা ছিল আমি বোঝাতে পারবো এবং তুমিও বুঝতে পারবে। আর কেউ বোঝেনি বা আমিও বোঝাতে পারিনি। কিন্তু আবার সরকারী নির্দেশে তুমি থেকে গেলে দিল্লীতে, কলকাতা এসে পৌঁছতে পারলে না আর খবরটা পেলে চেনা-মহল থেকে। মনে হচ্ছে, বেশ সরস ব্যাখ্যান-সহকারেই পেয়েছ। তুমি সেসব কথা বিশ্বাস করনি, তার প্রমাণ তোমার এই চিঠি—আর আমি যে তোমাকে সবিস্তারে বোঝাতে চাই, তার প্রমাণ আমার এই চিঠি।

মানুষ বিবাহ করতে পারে অনেকবার, কিন্তু ভালবাসে মাত্র

একবার। বিবাহ ও ভালোবাসার প্রায় মিল হয় না, আনাড়ী ছেলের হাতে তোলা জলছবিতে যেমন একটা অংশ থেকে আর একটা অংশে তফাৎ থেকে যায় তেমনি। কিন্তু কখনো কখনো দুর্লভ সৌভাগ্যের ফলে কারো কারো ভাগ্যে বিবাহে আর প্রেমে মিল ঘটে যায়, তাকেই বলি যথার্থ সবর্ণ বিবাহ। তুলনায় অন্য সব বিবাহ অসবর্ণ। এখন এ-রকম সবর্ণ বিবাহের দ্বিত্ব একেবারেই অসম্ভব। আর কেউ না জানুক, তুমি নিশ্চয় জানো যে, আমার ভাগ্যে সবর্ণ বিবাহ ঘটেছিল। সেই জন্যেই তার দ্বিত্বে তুমি চমকিত হয়েছ, অন্যথা হতে না, সব দেশেই বিপত্নীকের দার-পরিগ্রহ একটা সাধারণ ঘটনা, তাতে চমকাবার কি আছে, বরঞ্চ অন্যথা হলেই চমকানো স্বাভাবিক।

কিন্তু জেনে রাখো যে আমি অরুন্ধতীকেই আবার বিবাহ করেছি—অপরার মধ্যে।

তুমি ভাবছো, আমাকে কবিত্বের ভূতে পেয়েছে; নতুবা এমন অদ্ভুত কথা বলছি কেন? কিন্তু ব্যাপারটা কি রকম জানো? এঁক আত্মার অন্য দেহে সঙ্করণের মতো। কবিত্ব ছেড়ে দর্শনশাস্ত্রের এলাকায় গিয়ে পড়লাম কি? মোটেই নয়। প্রেমিকের মৃত্যু হতে পারে; প্রেমের কখনো নাশ হয় না। তবে কোথায় কিভাবে থাকে? তা জানি না, কিন্তু অনুকূল আশ্রয় দেখবামাত্রই তাকে অবলম্বন করে। আমার বেলাতেও তাই ঘটেছে। অরুন্ধতীকে আশ্রয় করে যে প্রেম ছিল, তা অরুন্ধতীর মৃত্যুর পরে অরুণাকে (দ্বিতীয়ার ঐ নাম) অবলম্বন করেছে; আধার ভিন্ন, আধেয় সেই পুরাতন। কাজেই যারা

ভাবছে যে, অরুন্ধতীর মৃত্যু হওয়া মাত্র আমি তাকে ভুলেছি এবং অপরাকে ভালবেসেছি, তারা ভ্রান্ত। যাক, এখন তত্ত্ব থেকে তথ্যে নামা যাক।

সেদিন গিয়েছিলাম সিনেমায়, অবশ্য একাকীই। একটার পরে একটা আলো নিভে গিয়ে ঘর তখন ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে, এমন সময়ে লক্ষ্য পড়ল, আমাদের দু'সারি আগে সেই কৃত্রিম আলোয় বসে রয়েছে—চমকে উঠলাম, পিছন থেকে ঠিক যেন অরুন্ধতী। অর্ধ-প্রলম্বিত সুবিন্যস্ত চুলের ঠিক সেই ভঙ্গী, শুভ্র সুকুমার মুখের আভাস মাত্র দেখা যাচ্ছে, যেন শুক্লা তৃতীয়ার দ্বিধাগ্রস্ত চন্দ্রকলা। মন নিশ্চয় জানে, অরুন্ধতী হতে পারে না, তবু সংশয় করতে ভালবাসে। এ এক রকম মোহ, কিন্তু প্রেম মোহ ছাড়া আর কি? ছবি দেখা চুলোয় গেল, আমি বসে বসে সেই সংশয়-স্বরূপিণীর কুন্তলিনী-রূপ দেখতে লাগলাম। অরুন্ধতীকেও কতবার ঐভাবে দেখেছি,—প্রথম-বার তাকে এইভাবেই দেখেছিলাম। আমার ধারণা কি জানো? —মেয়েদের যথার্থ সৌন্দর্য প্রকাশ পায় পিছন থেকে দেখায়। সামনে থেকে তারা বড় স্পষ্ট, বড় প্রকট, বড় বেশী বাস্তব। কিন্তু এই রকম আভাসিত দর্শনে তাদের সৌন্দর্য কাঁপতে থাকে, দেখা-না-দেখার সীমান্তে হৃদয়-তাপের মরীচিকার মতো। মরীচিকা মিথ্যা কি সত্য, তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তা যে সুন্দর, তাতে মতবৈষম্য কোথায়?

অরুণাকে বিবাহ করবার পরে আমি নিজে তার খানকতক ছবি তুলেছি—ঐ প্রথম দর্শনের ভঙ্গীতে। ও বিস্মিত হয়ে

শুধোয়—এ কি রকম শখ? বলতে পারি নে যে, ওর মধ্যে আমি অরুন্ধতীকে দেখতে পাই। শুনলে খুশী হবে না, কোন্ মেয়ে বা অপরের বিকল্প হতে চায়? তার বকলমে অরুন্ধতীর নাম নিয়ে চলেছি, একথা শুনতে যেমন অদ্ভুত, তেমনি অপ্রীতি-কর ওর কাছে। এসব কথা কেউ বুঝতে চায় না, কবিত্ব ভাবে, পাগলামি ভাবে, নয় উচ্চাঙ্গের মতলবের সন্ধান পায় এর মধ্যে। তুমি ভুল বুঝবে না আশায় তোমাকে লিখছি।

ঐ ভঙ্গীতে অরুণার একটি তৈলচিত্র আঁকবার ইচ্ছা আছে। তরুণ ঘোষকে অনুরোধ করেছি—সে এখনকার শ্রেষ্ঠ তৈলচিত্রী। আজকালের মধ্যেই তার আমার বাড়ীতে আসবার কথা। বলা বাহুল্য, অরুণা খুশীর সঙ্গেই রাজী হয়েছে। ছবি আঁকবার কথায় কোন্ মানুষ অসন্তুষ্ট হয়! ওতে যেন সে অমরত্বের স্বাদ পায়। কিন্তু আসল কারণ জানতে পেলে অরুণা রাগে এবং লজ্জায় নিশ্চয় অরুণবর্ণ হয়ে উঠবে।

তোমাকে সম্পূর্ণ বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না, কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আশা করি তোমার স্ত্রী ভালো আছেন, তাঁকে নমস্কার জানিও। কিন্তু সাবধান, অদ্ভুত এই প্রেমতত্ত্ব যেন বলো না, তাতে সাধারণভাবে স্বামীসম্প্রদায় সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে তোমার উপরে তাঁর অবিশ্বাসের সূত্রপাত ঘটবে।

ইতি—

নৃপেন্দ্র

॥ স্ত্রীর ডায়েরী ॥

"আজ প্রথম ডায়েরী লিখতে বসেছি। সুখী মানুষ ডায়েরী লেখে না, কেননা কথা বলবার মনের মানুষ তার আছে। যার কথা বলবার মনের মানুষ নেই, সে লিখতে বসে ডায়েরী, সে ব্যক্তি দুঃখী ছাড়া আর কি ?

এ-কথা পড়লে আমার পরিচিত সবাই হাসবে, বলবে, 'এ কি কথা শুনি আজ অরুণার মুখে ?' তারা বলবে তোমার কথা বলবার লোক নেই ? বটে ! তবে নৃপেন্দ্রবাবু নামে ব্যক্তিটি কে ? তোমাদের দু'জনের মনের কথা-বলাবলির এমন খ্যাতি রটেছে যে, তোমাদের পরিচিতগণ আজ অপরিচিত হয়ে উঠেছে তোমাদের কাছে। কেবল অফিসের সময়টুকু ছাড়া দু'জনে ছায়া আর কায়ার মতো সংসক্ত হয়ে আছো, একজনকে ছাড়া অপরকে যদি কেউ দেখে থাকে, তবে তার পক্ষেই ডুমুর ফুল দেখা সম্ভব। আবার নৃপেনবাবুর অফিসের টেলিফোনটাতেও এমন কণ্ঠস্বর সদা-সর্বদা ধ্বনিত হয়, যার মিষ্টতার তুলনা পাওয়া যায় না সরকারী মহলে। শুনতে পাওয়া যায় যে, ওখানে নাকি নূতন লাইন বসাতে হয়েছে। আর আজ তুমি অরুণা বলছ যে কথা বলবার মনের মানুষ নেই তোমার ! বিশ্বাস করতে হবে যে তুমি অসুখী ! একথা কে না জানে যে পাড়ার সমস্ত বয়স্কা মেয়ে তোমাকে ঈর্ষা করে। বলে—কী এমন ওর গুণ ? এম-এ পাশ ! আজকাল গণ্ডায় গণ্ডায় লুটোচ্ছে ! রূপ ? হ্যাঁ, তবে চুলের কিছু ঐশ্বর্য আছে বটে, একথা ওর

শত্রুকেও স্বীকার করতে হবে।

হায়রে আমার চুল! হায়রে তার ঐশ্বর্য! একদিন ওর গৌরব মনে ছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু আজ ওই হয়েছে আমার মৃত্যু-পাশ। কথামালার শৃঙ্গগর্বী সেই হরিণটার কাহিনী মনে পড়ছে। বান্ধবীরা পরিহাস করে বলতো, নৃপেনবাবুকে বুঝি চুলের ফাঁদ পেতে ধরলি? কেউ বা বলতো, পাখী ধরা দিল কুন্তল-জালে; কেউ কেউ বলতো, ওটা অরুণার নাগ-পাশ! এসব কথা শুনে মনে আনন্দ হ'ত। বিশেষ যখন মনে পড়ে, উনি প্রথম আমার চুলের ঐশ্বর্যেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। আর আজ? হায়রে, ঐ চুলের ফাঁস গলায় দিয়ে ঝুলে পড়তে ইচ্ছা করছে।

দুঃখের দিনে সুখের স্মৃতি যদি মনে না পড়তো, দুঃখ বুঝি এমন মর্মান্তিক হ'ত না। আজ বেদনার বহ্নি বিগলিত সায়াহ্নের ছায়ায় বসে আশার অরুণালোকের স্মৃতি চোখে পড়ছে! দুঃখের আঘাতে মন বিদীর্ণ না হলে বুঝি মানুষে কবি হয় না, নতুবা এমন ভাঁষা পেলাম কোথা থেকে? কখনো তো লিখি নি! লিখবার কথা মনেও আসেনি, সে অভাবই অনুভব করিনি। আমার সমস্ত যে পূর্ণ হয়েছিল সংসার-পথের প্রেমের পাথেয়-সম্ভারে! আজ সেই চলবার পথেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে প্রকাণ্ড গহ্বর। আর এক পা বাড়ালেই, কিংবা আমি যে গহ্বরে ইতি-মধ্যেই পড়িনি—তাই বা কে বল্‌ল!

একবার নিজের কাছে ঘটনাটা পারম্পর্যের সূত্রে সাজিয়ে পরিষ্কার করে নেই।

সেদিন সিনেমা থেকে বেরিয়ে এসে দেখি ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে। যে ক'খানা ট্যাক্সি ছিলো, তারা যাত্রী তুলেছে। আমি নিরুপায় হয়ে একান্তে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, উপায়ান্তর যখন নেই, অপেক্ষা করি। দেখি শেষ পর্যন্ত কি হয়, বৃষ্টি থামে না ট্যাক্সি পাওয়া যায়। এমন সময় উনি এসে ছোট্ট একটি নমস্কার করে বললেন, অনেক দূরে যাবেন মনে হচ্ছে, একখানা ট্যাক্সি করে দেবো কি?

আশ্চর্য এই লোকটি! তার পরে যখন ট্যাক্সিতে উঠলাম, বললাম, ধন্যবাদ।

উনি বললেন, হাতে হাতে ধন্যবাদ দিয়ে পরিচয়ের সূত্র ছিন্ন করে দিলে চলবে না।

—কিন্তু আপনি যে ভিজছেন!

—জল পড়লে ভিজতেই হবে।

—আপনি কোন্ দিকে যাবেন?

—আপনি কোন্ দিকে যাবেন? বিপরীত দিকে?

—আমি কোন্ দিকে যাব, কি করে জানলেন?

—সেটাই তো জানতে চাই।

হেসে ঠিকানা দিলাম।

বললেন—কবে আবার দেখা পাবো?

—যখন খুশি, আমি এমন কি দুর্লভ বস্তু?

—দুর্মূল্য তো বটেই। তবে কাল বিকালে যাবো?

—খুব। অপেক্ষা করবো।

আজ কত কথাই না মনে হচ্ছে! মনে হচ্ছে, এসব এই

সেদিনের কথা। অতীতের দিক থেকে কালকে দেখলে মনে হয়—কত স্বল্প! আর ভবিষ্যতের দিক থেকে দেখলে মনে হয়, যেন অন্তহীন!

হায়রে, যে-চুল শেষে আমার বৈরী হ'ল সেই পোড়া চুলের ঐশ্বর্যেই নাকি তিনি প্রথম মুগ্ধ হয়েছিলেন। পুরুষের প্রশংসাকে কখনো কোন মেয়ে অবিশ্বাস করতে পেরেছে কি? কোন অতি বৃদ্ধাও যদি পুরুষের মুখে প্রশংসা শোনে গোপনে, সে একবার দর্পণে মুখ দেখে নেয়! তিনি বলতেন, তোমার ঐ চুলের অনাবিল অজস্রতা ভোগবতীর বন্যার মতো দুর্দাম! বলতেন, তোমার খোঁপা যেন অমাবস্যার চাঁদের পাথর কুঁদে তৈরী, বলতেন, তোমার বেণী যেন চিত্রাঙ্গদার কটিবন্ধে দোদুল্যমান কিরীচ! এমনি আরও কত কি!

আমি কখনো কখনো ঠাট্টা ক'রে বলতাম, তুমি যে কাকে বেশী ভালোবাসো, বলতে পারি না—আমাকে না আমার চুলগুলোকে! ও যেন হ'য়েছে আমার সতীন।

অবশ্য আমি অরুন্ধতীর কথা জানতাম, তিনিও লুকোননি, আমিও খুব খুঁচিয়ে শুধোইনি, অনায়াসে যেটুকু জানা যায় জানতাম। অবশ্য তার ছবি দেখিনি, বাড়ীতে ছিল না। যদি জিজ্ঞাসা করতাম, ছবি নেই কেন?

বলতেন—আবার কি দরকার?

—আমার মৃত্যুর পরেও কি এমনি হবে নাকি?

বলতেন—ওসব কথা থাক্ অরু। যে রহস্য আজ ঠেকে শিখতে হচ্ছে, ছবি দেখতে পেলে তা বোধ করি দেখেই শিখতে

পেতাম। কিন্তু তা হ'বার নয়। মানুষের তো দুঃখ পাওয়া চাই। অত সহজে কি তার মুক্তি আছে?

আমার যে কত ছবি তুলেছেন! বলতেন, তোমার ছবি তোলবার উদ্দেশ্যেই ক্যামেরা কিনেছি।

আমি বলতাম—কিন্তু এ কি-রকম ছবি তোলা? অধিকাংশই হয় পিছন থেকে নয় পাশ থেকে! আমার মুখ দেখতে কি ভালো নয়?

—বলো কি? তোমার চোখের কি তুলনা আছে? যত চেয়ে থাকি, মনে হয়, তত যেন একটার পরে একটা আলোর পর্দা উঠে যাচ্ছে! কিন্তু অতুলনীয় তোমার চুলের ভঙ্গী, আর বসবার ঠাম! ওতে যেন তোমার সীমা অনেক বাড়িয়ে দেয়, ছড়িয়ে দেয় তোমার ব্যক্তিত্ব ছায়াপথ পর্যন্ত।

শেষে একদিন বললেন, নাঃ, তোমার একখানা তেলের ছবি আঁকিয়ে নেবো।

—ঐ ভঙ্গীতে বুঝি?

—শিল্পী যেমন ভালো বুঝবে।

—শিল্পীকে বুঝিয়ে দিতে কতক্ষণ! যে টাকা দেবে, তার ভালোতেই শিল্পীর ভালো।

—তোমার ঐ ভঙ্গীটি যদি আমার সবচেয়ে প্রিয় হয় তোমার চুলের কালো মঞ্জরী আমাকে যদি সবচেয়ে মুগ্ধ ক'রে থাকে, তবে তাতে তোমার আপত্তি কেন?

বললাম—আচ্ছা আচ্ছা, তাই হ'ল। তোমার যা ভালো লাগে, আমি তা-ই।

তিনি জানালেন যে দু-এক দিনের মধ্যেই তেলের ছবি আঁকতে শিল্পী আসবে।

এমন কাজ আগে কখনো করিনি। তাঁর কত চিঠিই তো আমার হাত দিয়ে গিয়েছে, খুলবার কথা কখনো মনে হয়নি। এবারে কী দুষ্টা সরস্বতী মাথায় চাপলো! খামের উপরে নাম পড়লাম কমল রায়। এ কে? কোনদিন এঁর নাম তো বলেন নি। আজকাল কমল রায় নাম তো মেয়েদেরও হ'য়ে থাকে। এর পরে চিঠি না পড়বে এমন মেয়ে কে থাকতে পারে? এ যেন জেনেশুনে নিজ হাতে প্যাণ্ডোরা-র বাক্স খুলে ফেললাম। কমল মেয়ে নয়, ওঁর কোন পুরুষ-বন্ধু, 'তোমার স্ত্রী' বলে এক জায়গায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে! কিন্তু এর চেয়ে জটিল সঙ্কট যে ছিল তা কে জানতো! হায়, কেন চিঠিখানা খুলতে গেলাম! এ-রকম ভাবে খোলা অন্যায়—তার প্রায়শ্চিত্ত তো করতেই হবে।

ওঃ, তবে এইজন্যেই আমার চুলের এমন আদর! আমি যখন ভেবেছি এ আদর আমার প্রাপ্য, তখন অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে অরুন্ধতী যে গ্রহণ করেছে তা কি ক'রে ভাববো! আমি তার বকলম! তার বিকল্প! সেকালে সতীন নিয়ে ঘর করতে হ'ত, সে বেদনা স্থূল, লোকে বুঝতো। সূর্যমুখীর দুঃখ আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকাকে কাঁদিয়েছে! কিন্তু আমার এই সূক্ষ্ম বেদনা কে বুঝবে? সবাই বলবে—সেন্টিমেন্টাল! বলবে তোমার স্বামী কবি-স্বভাব, তার পাগলামি নিয়ে তুমিও যদি

পাগলামি সুরু করো তবে সংসার অচল হ'য়ে দাঁড়ায়। অপরের অনুভব-গম্যতার মধ্যেই বেদনার একটা সান্ত্বনা আছে ; কিন্তু যে বেদনা বোঝানো যায় না তার চেয়ে দুর্বহ আর কী হতে পারে? এখন থেকে আমার চুলের উল্লেখমাত্র যে অরুন্ধতীর উল্লেখ। যখন উনি আমার চুল নিয়ে আদর করবেন সে আদর কি মৃত্যুর অন্ধকার পেরিয়ে অরুন্ধতীর কাছে পৌঁছবে না? আর যখন আয়নার সামনে দাঁড়াবো সে কি আমার পিছনে দাঁড়াবে না? আর ঐ তেলের ছবি? সে যেন আমার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। নাগিনী যেমন ক'রে নির্মোক ছাড়ে, তেমনি করে তাকে পরিত্যাগ করা যদি সম্ভব হ'ত!

কি মিথ্যা, কি মিথ্যা, কি অবাস্তব! এতদিনের আদর কোন্ অতল শূন্যতার মধ্যে পড়েছে! না, না, এর চেয়ে অতল শূন্যতাও বুঝি ভালো! এ সমস্ত গিয়ে পড়েছে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছায়াময়ী, মায়াময়ী, স্বপ্নশরীরী—অশরীরী, আর সেইজন্যই অপরিত্যজ্য, অবিনশ্বর। ভগবান এ কোন্ দুঃসহ সঙ্গীকে অদৃশ্যভাবে গ্রথিত ক'রে দিলে আমার কায়াতে আর সমস্ত সত্তায়।

তারপরে আবার ঐ তেলের ছবি! নাঃ, এমন ক'রে তাকে স্থায়ীভাবে সব কিছুর মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে না! আজই যাহোক একটা প্রতিকার করতেই হবে।"

বিকাল বেলায় নৃপেন্দ্র অফিস হইতে যখন ফিরিল, তখন সঙ্গে আসিল প্রসিদ্ধ তৈলচিত্রী তরুণ ঘোষ।

নৃপেন্দ্র ডাকিল, অরু, এদিকে এসো, মিঃ ঘোষ এসেছেন।

অরুণা গৃহান্তর হইতে উত্তর দিল, আসি। এবং তার পর মুহূর্তেই প্রবেশ করিল।

নৃপেন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া শুধাইল—এ কি!

বিজয়িনীর হাসি হাসিয়া অরুণা বলিল—এমন কিছু নয়। বড্ড অসুবিধা হচ্ছিল।

তরুণ ঘোষ কিছুই বুঝিতে পারিল না। অরুণাকে লক্ষ্য করিয়া শুধাইল—কবে আরম্ভ করবো?

অরুণা হাসিয়া নৃপেন্দ্রকে দেখাইয়া বলিল—ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

দুপুরবেলায় সাহেব-পাড়ায় এক চুলছাঁটাই দোকানে গিয়া অরুণা নিতান্ত হালফ্যাশানে খাটো করিয়া চুল ছাঁটিয়া আসিয়াছে।

সিন্দুক

কলিকাতার সহস্র বিদ্যুতালোকের তলে বসিয়া মন নিশ্চিন্তে বলে যে, ভূত-প্রেত দৈত্য-দানা কিছু থাকিতে পারে না ; জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্রে বসিয়া বলা সম্ভব বটে যে, সংসারে অলৌকিক বলিয়া কিছু নাই, কেননা বিজ্ঞান সমস্ত ত্রিলোকের সীমা সরহদ্দ মাপিয়া জুঁকিয়া পরীক্ষা করিয়াছে, কোথাও অলৌকিকত্ব পায় নাই। এ সবই সত্য স্বীকার করি। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, সংসারের সবটাই কলিকাতা নয়। এমন স্থানও আছে, যেখানে কি বিদ্যুতের আলো, কি বিজ্ঞানের আলো কিছুই প্রবেশ করে নাই। সেখানে মনের এমন নিশ্চিত ভাব থাকে কি? দিনের বেলায় যাহারা ভূতে বিশ্বাস করে না, রাতের বেলাতে তাহারাই ভূতের কথা শুনিলে জড়ো-সড়ো হইয়া বসে। প্রভেদ ঘটায় ঐ আলোতে। সে আলো বিদ্যুতের হইতে পারে, আবার বিজ্ঞানেরও হইতে বাধা নাই। যাক্, ও-সব তত্ত্ব-আলোচনা এক্ষেত্রে বাহুল্য। আজ আমি একটি ঘটনার বর্ণনা করিতে বসিয়াছি, কলিকাতার পাঠক কতখানি বিশ্বাস করিবে, জানি না। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে যাঁহারা জড়িত, তাঁহারা সকলেই যে মূর্খ বা গ্রাম্য লোক এমন নহে। তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান। বিশেষ, যাঁহার সঙ্গে এই ঘটনার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী এবং বিজ্ঞান বিষয়েও কৃতবিদ্য। তিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের

কর্তৃপক্ষদের অন্যতম। তাঁহার নামোল্লেখ করা উচিত হইবে না, কাজেই এই কাহিনীর মধ্যে তাঁহাকে র-বাবু বলিয়া উল্লেখ করিব।

র-বাবু আমার অনেককালের বন্ধু। একবার তিনি জানাইলেন যে, এবারে বড়দিনের বন্ধে আমাদের গ্রামে যাইবার ইচ্ছা তাঁহার আছে।

—চলুন না, এ সময়ে দুধ-মাছ প্রচুর।

—তা ছাড়া আর কিছু আছে কি?

—আবার কি থাকা সম্ভব?

—এই যেমন প্রাচীন ভগ্নাবশেষ।

—গ্রামে তো সবই প্রাচীন এবং তাহাও ভগ্নাবশেষের মধ্যে।

—না, পরিহাস নয়। কাছাকাছি প্রাচীন গ্রাম নেই কি? ভালো করে ভেবে দেখুন।

তখন মনে পড়িল যে, আমাদের গ্রামের পাঁচ মাইল উত্তরে চাঁপাডাঙা নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। গ্রাম মানে কেবল নামটাই আছে, জনপ্রাণীও নেই, সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। প্রবাদ আছে যে, নবাবী আমলে চাঁপাডাঙায় নবাবের ফৌজদার থাকিতেন, তখন গ্রামটির বিপুল সমৃদ্ধি ছিল। তারপরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে ফৌজদারী পদ লোপ পায়। কিন্তু গ্রামের সমৃদ্ধি তখনও ছিল। কিছুদিন পরে একবার মহামারীতে নাকি গ্রামের বারো আনা রকম লোক মারা যায়, বাকী সকলে উঠিয়া গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। সেই হইতে গ্রাম শ্মশান। শ্মশান বলিলে কম বলা হয়—সমস্ত অঞ্চলটি ছোট-

খাটো একটি অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কেবল সেকালের স্মৃতি জাগাইয়া পড়িয়া আছে প্রকাণ্ড সব অট্টালিকা, একটির পরে আর একটি, এমনি দু'তিন শত বিঘাব্যাপী। অধিকাংশ অট্টালিকাই এখন ধ্বংসস্তূপ, কোনটার প্রাচীর নাই, কোনটার ভিত্তি টলিয়া গিয়াছে, ছাদ বোধ করি কোনটারই নাই। সেখানে সাপ ও শিয়ালের অবাধ অধিকার। শীতকালে সাপ থাকে না, তবে মাঝে মাঝে গো-বাঘা বাহির হয় বলিয়া শুনিয়াছি। সেদিকে কাঠুরে ছাড়া আর কেহ যায় না, প্রয়োজন নাই বলিয়া যায় না, ভয়ের কারণ আছে বলিয়া যায় না। তবে কখনো কখনো গ্রামান্তরের বালক ও যুবকেরা চড়িভাতির জন্য গিয়া থাকে বটে, আমরাও কখনো কখনো গিয়াছি।

র-বাবুর কাছে চাঁপাডাঙার বর্ণনা করিলাম। ভাঙা বাড়ীর বিবরণ শুনিয়া মানুষের মুখ যে কিরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না, দেখিবার পরেও মাঝে মাঝে নিজের চোখকে অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

তিনি শুধাইলেন—আর কিছু আছে কি ?

—আর কি থাকবে ?

—এই যেমন শিলালিপি, কি মূর্তি ?

—মুসলমান ফৌজদারের গ্রামে মূর্তি কেমন করে থাকা সম্ভব ? তবে শিলালিপির সন্ধান তো কেউ করেনি, চলুন না, আপনি করবেন।

—বেশ তাই হবে। বড়দিনের ছুটির তো আর ক'দিন মাত্র বিলম্ব।

—ঠিক কথা, আর একটা প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক আছে।

—ভিতরে কি আছে ?

—কেমন করে জানবো ?

—কেন ?

—কেউ খুলতে পারলে তো ! আমরা একবার জন-দশেক মিলে চেষ্টা করে দেখেছি ডালা তোলা যায় না।

—তালাবন্ধ ?

—তালা বলে কিছু নেই। হয়তো ভারী বলেই তোলা যায় না, নয়তো ভিতর থেকে কোন কৌশলে আটকানো।

—খুব ইন্টারেস্টিং। ওটা খুলতে পারলে পুরানো কাগজপত্র পাওয়া যেতে পারে।

লোকে বলে, ওর মধ্যে থাকতো নবাবের খাজনার টাকা।

—অসম্ভব নয়।

—লোকের বিশ্বাস ওর মধ্যে বাদশাহী মোহর আছে।

—তার মানে পুরানো মোহর, র-বাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন—পুরানো মোহর অত্যন্ত দামী জিনিস।

—নূতন মোহরটাই যেন খোলামকুচি—

—না-না, সে দামের কথা ভাবছি না, ওর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অসীম।

—চলুন, গিয়ে দেখা যাবে। কিন্তু একথা জানবেন যে, ও সিন্দুক খোলা মানুষের সাধ্য নয়।

—কেন ?

—কেউ এ-পর্যন্ত খুলতে পারেনি, তা'ছাড়া ভয়ের কারণও

নাকি আছে বলে শুনেছি।

এবার র-বাবু প্রত্নতাত্ত্বিক হাসি হাসিলেন, বলিলেন, পুরানো বাড়ীর সঙ্গে সর্বত্রই স্মৃতি জড়ানো, বিশেষ ভূতের ভয়ের। ভূতের ভয় করলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাজ অচল হয়ে দাঁড়ায়। তা' ছাড়া কত পুরানো জায়গাতেই তো ঘুরলাম, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানা, অলৌকিক-অপ্রাকৃত তো কিছু চোখে পড়ল না।

দু'দিন হইল র-বাবুকে লইয়া আমার গ্রামে আসিয়াছি। স্থির হইয়াছে যে, আগামীকাল বেলা দশটার মধ্যে আহার সারিয়া র-বাবু, আমি এবং গ্রামের আরও চার-পাঁচজন যুবক চাঁপাডাঙায় রওনা হইব। পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়া যাতায়াত করা শীতের দিনে মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। সন্ধ্যার মধ্যেই আবার ফিরিয়া আসিব।

পরদিন বেলা একটার মধ্যেই চাঁপাডাঙায় আসিয়া পৌঁছিলাম। অরণ্যের গভীরতা এবং ভগ্নস্তূপের প্রাচুর্য দেখিয়া র-বাবুর প্রত্নতাত্ত্বিক মন ভারী খুশি হইয়া উঠিল ; তিনি বলিলেন, এ যে আর একটা গৌড়। হাঁ, এমনটিই আশা করছিলাম।

তারপর তাঁহার পিছু পিছু আমরা চলিলাম। যেখানে বেশী ভাঙা, সেখানেই তাঁহার বেশী আকর্ষণ। আস্ত দেয়াল দেখিবা-মাত্র সেদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকেন, আবার ভাঙা দেয়াল দেখিলেও সেই অবস্থা।

—র-বাবু একটু সরে দাঁড়ান, থামটা ধ্বসে পড়তে পারে!

—দাঁড়ান একটা ছবি তুলবার চেষ্টা করি। র-বাবু ক্যামেরা

বাগাইয়া ধরিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকের অপরিহার্য সঙ্গী ক্যামেরা।

কখনো বা একটা ভগ্ন থামের কাছে আর একটা ভগ্নপ্রায় থামের মতো নিশ্চল হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন। কি দেখিতে পান, তিনিই জানেন।

মোট কথা, তাঁহার সঙ্গে ঘণ্টা দুই ঘুরিয়া আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে, পারতপক্ষে কেহ যেন প্রত্নতাত্ত্বিকের সঙ্গে না বাহির হয়।

এবারে তিনি বলিলেন—চলুন, সিন্দুকটা দেখে আসি।

যে অট্টালিকার মধ্যে সিন্দুকটা আছে, লোকে তাহাকে সিন্দুক-বাড়ী বলে। তাহার দরজা-জানালা কিছুই নেই, তবে ছাদটা আছে, সেইজন্য ভিতরটা কেমন অন্ধকার-অন্ধকার।

সিন্দুকটা দেখিয়া র-বাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন—এ যে একটা ছোটখাটো ঘর, মশাই।

—তা বই কি। ওর মাপ-জোঁক আমাদের জানা আছে। পাঁচ ফুট খাড়াই, আর লম্বেপ্রস্থে দশ ফুট ও আট ফুট।

—হবেই তো। সেকালে তো কারেন্সী নোট ছিল না, খাজনার টাকা রাখবার জন্য প্রকাণ্ড সিন্দুকের দরকার হোত। কিন্তু কই, তালাচাবি তো দেখি না!

আমি বলিলাম—হয়তো এককালে ছিল।

—কিন্তু খুলতো কি উপায়ে?

আমি বলিলাম—হয়তো খুলবার কিছু কৌশল ছিল; নইলে শুধু গায়ের জোরে খোলা অসম্ভব।

—বাপ, এর ডালাটারই তো ওজন বোধ করি পঞ্চাশ মণ

হবে, বলিলেন র-বাবু।

—হবেই তো।

—সংখ্যায় আমরা বেশী হলে একবার চেষ্টা করে না-হয় দেখতাম।

—আমরা বিশজনে চেষ্টা করে দেখেছি।

আর একজন সঙ্গী বলিল—সেবার আমরা শিকারে এসেছিলাম। ফিরবার পথে সকলে মিলে চেষ্টা করলাম, সংখ্যায় জন-ত্রিশেকের কম ছিলাম না।

এমন সময়ে একদল চামচিকা ফড়-ফড় শব্দে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল এবং একটা ভীত শিয়াল পাশ দিয়া ছুটিয়া পালাইল।

আমি বলিলাম—চলুন, বাইরে যাওয়া যাক, ভিতরটায় কেমন ভাপসা গন্ধ, আর কেমন একরকম ছম্‌ছমে অন্ধকার।

আর একজন সঙ্গী বলিল—হাঁ, এবার কোথাও বসে চা খেয়ে নেওয়া যাক।

সঙ্গে ফ্লাস্কে চা ও টিফিন ক্যারিয়ারে খাদ্য ছিল।

সকলে বাহির হইলাম এবং বসিবার মত পরিচ্ছন্ন স্থান সন্ধান করিতে লাগিলাম। মনোমত স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে মিনিট দশেক সময় লাগিল, যখন সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম, দেখি যে র-বাবু নাই! কোথায় গেলেন? দু'চার মিনিট অপেক্ষা করিয়া নাম ধরিয়া ডাকাডাকি শুরু করিলাম! যে ঘন জঙ্গল, দলচ্যুত হওয়া বা পথ হারানো মোটেই অসম্ভব নয়।

যখন অনেক ডাকাডাকির পরেও উত্তর পাইলাম না, তখন

চারজন চারদিকে বাহির হইলাম। এ তো বিষম মুশকিল হইল দেখিতেছি!

কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে সমস্ত অঞ্চলটা প্রতিধ্বনিত করিয়া একটি আর্তকণ্ঠ শোনা গেল।

চারজনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, এ যে র-বাবুর স্বর!

—কোন্ দিক থেকে আসছে?

—চলো, সিন্দু-কবাড়ীর দিকে দেখা যাক।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কৌতূহলের অবসান হইল।

সিন্দুকবাড়ীতে ঢুকিতেই দেখিতে পাইলাম, সিন্দুকের কাছে র-বাবুর সংজ্ঞাহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত। আর কিয়দ্দূরে তাঁহার ক্যামেরা পড়িয়া আছে।

—কি করে হোল?

—কেন হোল?

—ভয় পেয়েছেন?

—না, না, ক্লান্তি। কলকাতার লোক বেশী, হাঁটবার তো অভ্যাস নেই!

আমি বলিলাম—আগে বাইরে নিয়ে চলো, তারপরে অন্য কথা।

চারজনে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিয়া মাঠের মধ্যে শোয়াইয়া দিলাম এবং একজন মাথায় বাতাস দিতে লাগিল। আমি নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলাম—না, নাড়ীর গতি ঠিক আছে, ভয় নেই।

—কিন্তু ওঁর গায়ের কাপড়টা গেল কোথায়?

দেখো তো অজয়, বোধ হয় সিন্দুকের কাছেই কোথাও পড়েছে।

এক মুহূর্ত পরে অজয় ছুটিয়া বাহিরে আসিল, মুখ তাহার সাদা।

—কি ব্যাপার! গায়ের কাপড় কই?

অস্ফুটকণ্ঠে অজয় বলিল—আপনারা কেউ যান।

—সে আবার কি?

আমি অগ্রসর হইতে যাইব, সে জামা ধরিয়া টানিল,—একা যাবেন না।

—বেশ তো, তুমিই এসো না।

এতক্ষণ পরে সাহস পাইয়া কিম্বা কৌতূহলের তাড়নায় সে আমার পিছু পিছু আসিল। আমি ঘরে ঢুকিয়া দেখি গায়ের কাপড়খানা মাটিতে লুটাইতেছে। আমি শুধাইলাম, হঠাৎ ভয় পেলে কেন?

সে কোন কথা না বলিয়া ইঙ্গিত করিল, দেখিয়া মুহূর্তের জন্য আমার গায়ের রক্ত যেন জল হইয়া গেল, দেখিলাম, গায়ের কাপড়ের একপ্রান্ত সিন্দুকের ডালা-চাপা!

দু'জনে তখনি বাহির হইয়া আসিলাম এবং অনেক খোঁজা-খুঁজির পরে একখানা গোরুর গাড়ী সংগ্রহ করিয়া র-বাবুর অর্দ্ধ-সংজ্ঞাহীন দেহ তাহাতে চাপাইয়া দিয়া রাত্রি প্রথম প্রহর অতীত সময়ে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

ডাক্তার বলিয়া গেলেন, ভয়ের কারণ নাই, কোন কারণে অকস্মাৎ নার্ভাস শক পাইয়াছেন। অপ্রীতিকর আলোচনা উঠিতে পারে, এমন কোন প্রসঙ্গ তুলিতে নিষেধ করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। সামান্য গরম দুধ মাত্র পান করিয়া র-বাবু তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে পড়িয়া রহিলেন।

পাশের ঘরে আমরা পরস্পরকে শুধাইতে লাগিলাম, গায়ের কাপড় সিন্দুকের ডালা চাপা পড়িল কি-রকম ভাবে?

—ও ডালা পঞ্চাশজন লোকে ঠেলে তুলতে পারে না।

—আর খুব সম্ভব ভিতর থেকে বন্ধ!

—তবে কি!

র-বাবুর মূর্ছা আর আমাদের কাছে বিস্ময়জনক নয়, আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম মূর্ছার কারণ ঐ অসম্ভব ব্যাপারের মধ্যে নিহিত। কিন্তু সেটা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল? হয়তো র-বাবু বলিতে পারেন, কিন্তু ও-সব প্রসঙ্গ তুলিতে ডাক্তারের বিশেষ নিষেধ।

এই ঘটনার পরে র-বাবু আমাদের গ্রামে মাত্র আর তিনদিন ছিলেন। সকলেই বলিল—আর নয়, একটু সুস্থ হইবামাত্র ঘরের ছেলেকে ভালোয় ভালোয় ঘরে পাঠাইয়া দাও। যে কয়দিন তিনি ছিলেন, একদম কথাবার্তা বলিতেন না, এমন কি পাশে আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকিলেও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। অতএব তাঁহার দ্বারাও যে রহস্যভেদ হইবে, সে আশা বড় রহিল না এবং সত্য সত্যই আমাদের সম্মিলিত কৌতূহলকে অপরিতৃপ্ত রাখিয়া তিনদিন পরে তিনি কলিকাতায়

চলিয়া গেলেন।

কয়েকদিন পরে র-বাবুর চিঠি পাইলাম, তিনি লিখিতেছেন—

'এতদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছি এবং বোধ হয় ধীরভাবে চিন্তা করবার শক্তিও ফিরে পেয়েছি, কাজেই ভাবছি যে আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যা লিখবো তাতে আপনাদের কৌতূহল শান্ত হবে কিনা সন্দেহ, কেননা সেদিন যা ঘটেছিল আমি আজও তার পূর্বাপর খুঁজে পাচ্ছি না। যাই হোক, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল লিখছি।

আপনাদের সঙ্গে সিন্দুকবাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেই মনে হ'ল যে, সিন্দুকটার একটা ছবি তুলে নিলে হ'ত। আপনারা তখন খানিকটা এগিয়ে গিয়েছেন, তাই আপনাদের আর ডাকলাম না, ভাবলাম ছবি তোলা দু' মিনিটের ব্যাপার।

আবার সিন্দুকবাড়ীতে ঢুকলাম। কিন্তু ছবি তুলতে গিয়ে দেখি যে সম্ভব নয়। একে তো ভিতরটা অন্ধকার তার পরে আবার বেলা পড়ে এসেছে, দু'চার মিনিট চেষ্টা করে যখন বুঝলাম যে অসম্ভব, তখন বের হবার জন্য মুখ ফেরালাম। এমন সময়ে অনুভব করলাম আমার গায়ের কাপড়খানা ধরে কে যেন টানছে, ফিরে দেখি, সিন্দুকের ডালা একটু ফাঁক হয়েছে, আর ভাবলে এখনো সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে, তার মধ্যে থেকে একখানা হাতের কিয়দংশ, সে হাতে রক্তমাংস নেই, শুধু চর্ম দিয়ে শুধু হাড় ক'খানা ঢাকা, সেই হাত আমার চাদর ধরেছে। এক মুহূর্তের জন্য আমার শরীরের রক্ত জমে গিয়ে আমি যেন পাষাণ

হয়ে গেলাম, তার পরেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম। পড়বার সময়ে খুব সম্ভব চীৎকার করে উঠেছিলাম, সেই চীৎকার শুনেই আপনারা এসে থাকবেন।

আর কিছুই মনে নেই, তবে এ নিশ্চয় বলতে পারি, অত বড় ভারী ডালাটা যে ফাঁক হ'ল, এতটুকু শব্দ হয়নি, আর এটাও অর্ধ চৈতন্য অবস্থায় মনে আছে যে, ডালাটা নেমে যাবার সময়েও এতটুকু শব্দ করেনি! ঐ এক মুহূর্তের মধ্যেই সিন্দুকটার ভিতরেও বোধ করি আমার দৃষ্টি একবার পড়ে থাকবে, নইলে এ স্মৃতি কোত্থেকে এলো যে, ভিতরে যেন পুঞ্জিত ধোঁয়ায় গঠিত বিরাট একটা দেহ সিন্দুকটার সমস্তটা পূর্ণ করে রয়েছে। আর কিছু মনে নেই। তা ছাড়া ঐ স্মৃতিটাই বিষাক্ত বলে মনে হচ্ছে, ওটাকে সযত্নে চাপা দিয়ে রাখছি। যেটুকু নেহাত না লিখলে নয়, আপনারা নিশ্চয়ই জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছেন, তাই লিখলাম। এ বিষয়ে আর কোন প্রকার আলোচনা করবার ইচ্ছা আমার নেই।'

র-বাবুর চিঠিতে রহস্যভেদ না হইয়া রহস্য ঘনতর হইয়া উঠিল মাত্র।

ইহার পরে আর অল্পই বলিবার আছে। র-বাবু চলিয়া আসিবার পরে একদিন আমরা আট-দশজনে মিলিয়া চাঁপাডাঙায় গিয়াছিলাম গায়ের কাপড়খানার কি হইল জানিবার উদ্দেশ্যে। সিন্দুকের কাছে গিয়া দেখি গায়ের কাপড়খানার চিহ্নমাত্র নাই। তখনি আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। সকলেই মনে মনে বুঝিলাম, যদিচ মুখে কেহ কিছু প্রকাশ করিলাম না যে কাপড়-

খানা সিন্দুকের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে, অন্য কোন প্রকারে তাহার লোপ পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

গণ্ডার

আসামের গভীর অরণ্যে খড়্গনাসা নামে এক গণ্ডার বাস করিত। সে অন্যান্য গণ্ডার-দলের সহিত নলখাগড়া বেষ্টিত পল্বলে ডুব দিয়া ও সাঁতার কাটিয়া দীর্ঘ দিন যাপন করিত, খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিত এবং জ্যোৎস্না রাত্রিতে মাঠের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত। কিন্তু তাহার মনে সুখ ছিল না। অন্যান্য গণ্ডারগণ তাহাকে বড়ই অবহেলা করিত। গণ্ডারের চামড়া যে অত্যন্ত পুরু, এই সত্য এখন মানুষেও জানিয়া ফেলিয়াছে এবং এই কঠিন সত্য লইয়া গণ্ডারকুল গৌরব করিয়া থাকে। খড়্গনাসার চামড়া আশানুরূপ পুরু ছিল না বলিয়া তাহার দলের গণ্ডারসমূহ ঠাট্টা করিত, তাহাকে বলিত, তোমার চামড়া মানুষের মতো কোমল, তোমার গণ্ডারকুলে না জন্মিয়া মানুষের ঘরে জন্ম লওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জন্মটা তো আর তাহার হাতে নয়, কাজেই কেন যে এই অপরাধের শাস্তি ভোগ করিবে তাহা সে বুঝিতে পারিত না।

এমন সময়ে এক ঘটনা ঘটিল। সেই অরণ্য প্রদেশের গণ্ডাররাজের দেহান্ত ঘটিলে শ্রাদ্ধোপলক্ষে আর সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল, কেবল খড়্গনাসা নিমন্ত্রিত হইল না। ইহাতে সে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করিয়া আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু মরিবার উপায় কি? সে শুনিয়াছিল, মানুষেরা অনেক সময়ে দম্পতি-কলহের পরিণামে গলায় দড়ি দিয়া মরে। কিন্তু দড়ি,—তাহার দেহভার বহন করিতে সক্ষম এমন শক্ত দড়ি, সে পাইবে কোথায়? আর দড়ি পাইলেই বা গলা পাইবে কোথায়? গণ্ডারের মুণ্ডুর সঙ্গেই দেহটা যুক্ত—বিধাতা গলা দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কাজেই সে স্থির করিল যে, প্রায়োপবেশনে বিধাতার তপস্যা করিবে। তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিধাতা-পুরুষ আবির্ভূত হইলে সে একটা গলা চাহিয়া লইবে এবং তার পরে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়া সমস্ত জ্বালার অবসান করিয়া ফেলিবে।

খড়্গনাসা বিষম তপস্যা সুরু করিয়া দিল। সেই তপস্যার খ্যাতি কিম্বদন্তী আকারে এখনো আসামপ্রদেশে প্রচলিত আছে। অনেকে হয়তো তাহা শুনিয়াও থাকিবেন। দীর্ঘকাল তপস্যার পরে বিধাতা সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার সম্মুখে এক দিন সত্য সত্যই আবির্ভূত হইলেন। খড়্গনাসা তাহাকে মনের দুঃখ নিবেদন করিলে বিধাতা বলিলেন—বৎস একটা গলা লইয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিলে আর এমন কি লাভ? তার চেয়ে তুমি মনুষ্যকুলেই জন্মগ্রহণ করো না কেন? মনুষ্যত্ব লাভ করিলে তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে। খড়্গনাসা এই প্রস্তাবে আশাতীত আনন্দিত হইল এবং মানুষকুলে জন্মিবার বর লাভ

করিল। বিধাতা অন্তর্ধান করিলেন।

পরজন্মে খড়্গনাসা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিল। সে মানুষ হইল বটে কিন্তু তাহার নাসিকাটির পূর্বজন্মসুলভ উচ্চতার হ্রাস হইল না। তাহার বিচিত্র নাকটি দেখিয়া তাহার আত্মীয়স্বজনেরা তাহাকে গণ্ডার বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। তাহার পিতা মাতা অবশ্যই তাহাকে একটা শ্রুতিমনোহর নাম দিয়াছিল—কিন্তু সেটা ওই গণ্ডার নামের তলে চাপা পড়িয়া গেল। মনুষ্য সমাজে তাহার গণ্ডার নামই প্রচলিত রহিল। সমবয়স্ক বালকদের সহিত খেলিতে খেলিতে পড়িয়া গেলে সেই আঘাতে তাহার কিছুই হইত না। ছেলেরা বিদ্রূপ করিয়া বলিত, বেটার গণ্ডারের চামড়া। এই কথায় ক্ষীণ পূর্বস্মৃতিবৎ তাহার মনে উদিত হইত—ইহার বিপরীত কথা কোথায় যেন, কবে যেন সে শুনিয়াছে—কিন্তু ঠিক কবে এবং কোথায় তাহার মনে পড়িত না।

গণেশ (ইহাই তাহার পিতৃদত্ত নাম) পাঠশালায় ঢুকিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িল। ছেলেরা কড়াকিয়া পড়িবার সময়ে সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিত 'চার কড়ায় এক গণ্ডার'! আর সবাই হোহো করিয়া হাসিতে থাকিত। গুরু মহাশয় ঘুম ভাঙিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিতেন—হাঁ রে, হাসছিস্ কেন? সবাই বলিত, দেখুন না, গণেশ কি রকম করছে। গণেশ বলিত—ওরাই আমাকে ক্ষেপাচ্ছে—আমাকে গণ্ডার বলছিল। গুরু মহাশয় গণেশের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতেন—তা তুই ও-রকম মুখ ক'রে আছিস্ কেন? গণেশ বুঝিতেই পারিত না, চুপ করিয়া থাকিত। অপরাধীর নীরবতাই অনেক ক্ষেত্রে তাহার

অপরাধের প্রমাণ। গুরু মহাশয় বেতগাছা হাতে করিয়া তাহার উপরে পড়িতেন, বলিতেন—তুই গণ্ডার ছাড়া আর কি, একশো-বার গণ্ডার, এত শক্ত কি মানুষের চামড়া? বেতগাছা ভাঙিত, গণেশ ভাঙিত না, কাজেই প্রমাণ হইয়া যাইত, সে গণ্ডার ছাড়া কিছুই নয়।

অতঃপর গণ্ডার হাই-স্কুলে প্রবেশ করিল। হাই-স্কুল শব্দটি সে আগেই শুনিয়াছিল এবং তাহার ধারণা হইয়াছিল, তাহা কোন একটা উচ্চ বস্তু হইবে। কিন্তু স্কুল-গৃহটি আর দশটি গৃহের মতোই বলিয়া তাহার মনে হইল, কাজেই সে 'হাই' শব্দের সার্থকতা বুঝিতে না পারিয়া হেড মাস্টার মহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইল। হেড মাস্টার তো তাহার প্রশ্ন শুনিয়া অবাক্। সত্য কথা বলিতে কি, হাই-স্কুল কেন যে 'হাই' তাহা তিনিই জানেন না। কিন্তু কোন ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে জানি না বলা আর নিজের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ স্বাক্ষর করা একই কথা। এ-রকম ক্ষেত্রে একমাত্র যাহা কর্তব্য তিনি তাহাই করিলেন, বিষম রাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন—এসব প্রশ্ন শিখিলে কোথায়? এই অল্প বয়সেই খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশতে শিখেছ, না?

হেড মাস্টারের উত্তর শুনিয়া তাহার কেমন যেন সন্দেহ হইল, 'হাই' শব্দের অর্থ হয় তো 'লো' হইবে। তবু সে দমিল না—শুধাইল—স্যর, হাই শব্দের অর্থ তো উচ্চ? ইহার পরে কোন হেড মাস্টারের পক্ষেই আর ধৈর্যধারণ সম্ভব নয়। তিনি হাঁকিয়া উঠিলেন—বেয়ারা, ওই পাজি ছেলেটাকে ধরো তো। এই নির্দেশ শুনিবামাত্র গণ্ডার ছুটিয়া পলাইল। ছেলের দল

তাহার পিছে-পিছে ছুটিল, অনেকেই তাহার পূর্ব-পরিচিত, তাহারা 'ওই গণ্ডার যায়, ওই গণ্ডার যায়' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হাইস্কুলে প্রবেশের প্রথম দিকেই তাহার গণ্ডার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

এই ব্যাপার হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, তাহার হাই স্কুলের জীবন বড় সুখের হইল না। তাহার উপরে অত্যাচার হইলে আগে সে রাগিত, তাহার রাগ দেখিয়া ছেলেরা গণ্ডার বলিয়া তাহাকে আরও বেশী করিয়া ক্ষেপাইত। এখন রাগ চাপিতে গিয়া সে কাঁদিয়া ফেলে—তাহার চোখের জল দেখিয়া ছেলেরা বলে—গণ্ডার দমকল খুলে দিয়েছে।

কিন্তু এ সংসারে কাহারো জীবন অনবচ্ছিন্ন দুঃখের নয়। দুর্ভাগ্যের দেয়াল নিরেট হইলেও তাহাতে জানালা থাকিতে বাধা নাই। স্কুলে একদিন ইন্‌সপেক্টার আসিলেন। তিনি গণেশের ক্লাশে ঢুকিয়া ছাত্রদের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ভাগ্যের ইঙ্গিতে তাঁহার প্রথম প্রশ্নটি হইল—গণ্ডার সম্বন্ধে কি জানো, বলো? সকলে গণেশের দিকে তাকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। ক্লাসের সেরা ছাত্রটি গণ্ডার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিল তাহাতে বুঝিতে পারা গেল, উহা এক প্রকার চারখানি পা-বিশিষ্ট জীব। ইহার বেশী কেহই বলিতে পারিল না। ইন্‌সপেক্টার যখন বিরক্ত হইয়া ক্লাশ পরিত্যাগ করিতে যাইবেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল গণেশের দিকে, বলিলেন—তুমি বলতে পারো? সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়া গণেশ গণ্ডারের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নিখুঁত একটি বর্ণনা দিল। ইন্‌সপেক্টার খুশী হইয়া তাহার

পিঠ চাপড়াইয়া হেড মাস্টারকে বলিলেন—ভেরি ইন্‌টেলিজেন্ট, এর একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

ইন্‌সপেক্টার চলিয়া গেলে ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—ও কেন পারবে না? আর জন্মে ও গণ্ডার ছিল। যথাসময়ে গণেশ একটি স্কলারশিপ পাইল; কিন্তু ছেলেরা তাহাকে স্কলারশিপ না বলিয়া তাহার নামকরণ করিল—'গণ্ডারশিপ'।

এইভাবে সুখে-দুঃখে গণেশের হাই স্কুলের জীবন শেষ হইল।

স্কুলের বাহিরের জীবনও গণেশের পক্ষে যে খুব প্রীতিকর ছিল এমন নয়। পাড়ায় একটি মাত্র সরিষার তৈলের দোকান। সেখানে এমন ভিড়, এমন ঠেলাঠেলি, পরস্পরের গাত্রে এমন ঘর্ষণ যে কেহ পকেটে সরিষা ভরিয়া সেই ভিড়ে প্রবেশ করিলে সেই সরিষা হইতে তৈল বাহির হইয়া পড়িবে। এক দিন গণেশের মা বলিলেন,—ওরে, যা তেল নিয়ে আয়।

গণেশ বড়ই মাতৃভক্ত। সে অমনি একটি পাত্র লইয়া দৌড়িয়া গিয়া ভিড়ের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিল। এক ঘ[illegible] পরে ছিন্নবস্ত্র, বিদীর্ণচর্ম হইয়া এক পোয়া তৈলাক্ত এক প্র[illegible]ার বস্তু লইয়া যখন সে বাহির হইল, তাহার গা জ্বালা করিতে লাগিল। তৈল নামক যে-বস্তু সে পাইয়াছিল তাহার অনেকটাই গেল ক্ষতস্থানে লাগাইতে। তার পর হইতে সে প্রায়ই ভাবিত লোকে কেন আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া আছে বলিয়া পরিহাস করে? মানুষের গায়ের চামড়াও তো কম পুরু নয়, নতুবা

আমার গা কেন ক্ষত-বিক্ষত হইতে গেল ?

গণেশ জানিত না এবং অনেকেই জানে না যে, মানুষের গায়ের চামড়া বিধাতা ইচ্ছা করিয়াই মোটা করিয়া দিয়াছেন। নতুবা সংসারের মতো সংঘর্ষ-বহুল স্থানে মানুষে বাঁচিবে কি উপায়ে ? বিধাতা কেন যে মানুষের চামড়া আরও পুরু করিয়া দিলেন না, ইহাই তো মানুষের নালিশ হওয়া উচিত। গণ্ডারের চামড়া মোটা বটে কিন্তু মানুষের চামড়া ততোধিক মোটা, নতুবা পূর্বজন্মের গণ্ডাররূপী গণেশের সংসারে এমন কষ্ট হইবে কেন ?

গণেশদের সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কাজেই তাহার বিবাহ দিবার জন্য পিতা মাতার কর্তব্য-বোধ জাগ্রত হইয়া উঠিল। আর বাংলা দেশও এমন স্থান যে, এখানে আর্থিক অবস্থা ও বিবাহের তৎপরতা পরস্পর-প্রতিকূল। গরীব এখানে শীঘ্র বিবাহ করিয়া ফেলে, ধনীর সন্তান বিবাহ করিতে চায় না। কিন্তু বোধ করি ভুল করিলাম, কেননা, বিবাহের অপেক্ষা বিবাহের চেয়ে বড়তে খরচ কিছু বেশী। স্ত্রীকে 'না' বলিয়া ক্ষান্ত করা যায়, কিন্তু ক্ষণিকাকে 'না' বলিতে সাহস হয় না। যাই হোক, শুভলগ্নে গণেশের বিবাহ হইয়া গেল।

পাড়ার ছেলেমেয়েরা আড়ালে গণেশের স্ত্রীকে গণ্ডারণী বলিয়া উল্লেখ করিত। একদিন পাড়ার একটি অবোধ বালক তাহাকে গণ্ডারমাসী বলিয়া সকলের সম্মুখে ডাকিয়া ফেলিল। সেদিন রাত্রে গণেশকে তাহার পত্নী জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ গো, সবাই আমাকে গণ্ডারমাসী, গণ্ডারণী বলিয়া ডাকে কেন বলিতে পারো ? বলিতে পারিলেও গণেশের বলা উচিত ছিল না। কিন্তু

গণেশের যে কেবল চামড়াখানাই কিছু মোটা ছিল এমন নয়, বুদ্ধিটাও মোটা ছিল। সে সবিস্তারে তাহার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিল। সমস্ত শুনিয়া তাহার স্ত্রী বলিল—সত্যিকার গণ্ডারণীকে বিবাহ করাই তোমার উচিত ছিল। গণেশের জীবনে ধিক্কার জন্মিল। সে সেই রাত্রেই ঘরের জানালার শিক ভাঙিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

গণেশ পুস্তকে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কথা পড়িয়াছিল। ভাবিল, আমিও সেইরূপ গৃহত্যাগ করিব এবং তপস্যায় মনোনিবেশ করিব। কিন্তু কোথায় যে তপস্যার অনুকূল বন, আর ঠিক কোন্ দিকে যে নৈরঞ্জনা নদী সে বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকাতে, বিশেষ সিদ্ধার্থের মতো রথ ও সারথীর ঐকান্তিক অভাব হওয়াতে, সে নিকটস্থ এক প্রান্তরে বসিয়া ভবিতব্যের চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, বিধাতা আমার চামড়া কেন মানুষের মতো করিয়া সৃষ্টি করিলেন না? তাহা হইলে তো আমার এমন দুর্দশা ঘটিত না। পূর্বজন্মের তপস্যার কথা মনে পড়িলে সে বুঝিয়া বিস্মিত হইত যে, ঠিক ইহার বিপরীত প্রার্থনা সে এক সময়ে করিয়াছিল। সেদিন সে পুরু চামড়া চাহিয়াছিল, আর আজ তাহার প্রার্থনা কোমল চামড়া। কি পশুকুলে, কি নরকুলে কোথাও যে সন্তোষ নাই তাহাই কি ইহাতে প্রমাণ হয় না? সে ভাবিতে লাগিল—হায়, মানুষ হইলাম তো চামড়াখানি মানুষের চর্মসুলভ কোমলতা হইতে কেন বঞ্চিত হইল? নির্বোধ গণেশ জানিত না যে শুধু চামড়াখানি নয়, তাহার বুদ্ধিও মনুষ্যসুলভ স্থিতিস্থাপকতা পায় নাই। গণ্ডার

সুলভ একগুঁয়েমি বহন করিয়া সে মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

যখন সে এইরূপ চিন্তায় মগ্ন তখন শুনিতে পাইল কে যেন কোথা হইতে বলিতেছে—সম্পাদক হবি? সম্পাদক হবি? গণেশ চমকিয়া উঠিল? কে কথা বলে? কই, কাহাকেও তো দেখা যাইতেছে না! হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল গাছটির উঁচু একটি ডালের দিকে।

বাহুল্য বলিয়া প্রকাশ করি নাই যে, সে একটা গাছের নীচে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল। কারণ বুদ্ধ, যুধিষ্ঠির নিউটন, যিনি যখনই চিন্তা করুন না কেন, বৃক্ষতলে বসিয়াই চিন্তা করিয়াছেন। তবে গণেশের বেলাতেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইতে যাইবে কেন?

সে দেখিতে পাইল একটি শুক পক্ষী ক্রমাগত প্রশ্ন ধ্বনিত করিয়া যাইতেছে—সম্পাদক হবি? গণেশ শুধাইল—তুমি কে? শুক পক্ষী বলিল—আমি একটি শুক পক্ষী। কিন্তু এই সৌভাগ্য এইমাত্র লাভ করিয়াছি। কিছুক্ষণ আগে আমি প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্র 'জম্বুদ্বীপের' সম্পাদক ছিলাম। মৃত্যু হইবামাত্র আমি শুক-জন্ম লাভ করিয়া এই বৃক্ষটিতে আসিয়া বসিয়াছি। এখনো আমার মৃতদেহটা অফিসে পড়িয়া আছে, আর তাহার ফটো তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। নিশ্চয় এখনো নূতন সম্পাদক নিযুক্ত হয় নাই, যদি তোমার সম্পাদক হইবার ইচ্ছা থাকে তবে 'জম্বুদ্বীপ' আফিসে যাইতে পারো। এই কথা শুনিবামাত্র পরিণাম-অজ্ঞ নির্বোধ গণেশ 'জম্বুদ্বীপ' পত্রিকার আফিসের

দিকে ছুটিল। তাহার সংসার-বৈরাগ্য যে নিতান্ত শ্মশান-বৈরাগ্য, চতুর পাঠক তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন।

গণেশের যদি মনুষ্যসুলভ অভিজ্ঞতা থাকিত তবে শুক পক্ষীর মৃত্যুর বিবরণ নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু সে করে নাই বলিয়াই আমরা করিব না কেন? আর লেখকের সুবিধা এই যে, সে জিজ্ঞাসা না করিয়াও সব কথা জানিতে পায়। সম্পাদকের মৃত্যুর কারণ আর কিছুই নয়, একত্রিশ বৎসর ধরিয়া সংবাদপত্র সম্পাদনা করিতে করিতে, বাঁধা-বুলির পথে চলিতে চলিতে, সম্পাদক মহাশয় একটি আধ্যাত্মিক শুক পক্ষীতে পরিণত হইয়াছিলেন, যদিচ দেহটি তখনো মানবীয় ছিল। কিন্তু ঘটনা-ক্রমে এক দিন নরদেহের শাপ বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ শুক পক্ষীরূপে তিনি আকাশে উড্ডীন হইয়া গেলেন। ঘটনাটি এইরূপ: একদিন গঙ্গাতে স্নানাহ্নিক সমাধা করিয়া তিনি একটি সুপক্ক কদলী ভক্ষণ করিতে করিতে মনের আনন্দে বাড়ী ফিরিতে-ছিলেন, এমন সময়ে একটি দুষ্ট বায়স তাহার হাত হইতে অর্দ্ধ ভুক্ত কদলীটি ছোঁ মারিয়া লইয়া পালাইল। সম্পাদক মহাশয় বিস্মিত রোষে পলায়মান বায়সটির দিকে তাকাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল—আহা তিনি যদি একটি পাখী হইতে পারিতেন তবে একবার কাকটিকে দেখাইয়া দিতেন, সম্পাদকের কলাতে অনধিকার-চর্চার ফল কি বিষম হইতে পারে। যেমনি না এই ইচ্ছা হওয়া, অমনি তাঁহার অতীন্দ্রিয় সত্ত্বা একটি শুক পক্ষীতে পরিণত হইয়া কাকের পশ্চাদ্ধাবন করিল। তাঁহার আধিভৌতিক দেহ অসাড় হইয়া ভূপতিত হইল। সকলে বলিল—তিনি সন্ন্যাস

রোগে মারা গিয়াছেন। কিন্তু কেহই আসল রহস্য জানিতে পারিল না। ইহাই সম্পাদকের শুক পক্ষী হইবার ভিতরকার কথা।

এদিকে গণেশ ছুটিতে ছুটিতে সংবাদপত্র আফিসে গিয়া উপস্থিত হইয়া তাহার প্রার্থনা জানাইল। মালিক তাহার কথা শুনিয়া, তাহার গায়ের চামড়া হাত দিয়া টিপিয়া দেখিয়া, তখনই তাহাকে সম্পাদক-পদে বসাইয়া দিলেন। গণেশ ভাবিল, এত-দিনে বিধাতা প্রসন্ন হইয়াছেন। হায় গণেশ, তোমার এখনও বুঝিতে বিলম্ব আছে যে বিধাতা-পুরুষ তোমার অপেক্ষা কম চতুর নহেন।

সম্পাদক হইয়া গণেশ প্রথম দিনেই বুঝিতে পারিল, এতদিনে তাহার স্থূল চর্মের অনুরূপ কর্ম জুটিয়াছে। সন্ধ্যা বেলায় যখন সে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে মালিক আসিয়া এক পদাঘাত করিয়া তাহাকে নীচে ফেলিয়া দিল। কিন্তু তাহাতে গণেশের শরীর ক্ষত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার চামড়ার স্পর্শে মালিকের জুতার চামড়া ছিন্ন হইয়া মালিকের পায়ে রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। ইহার ফলে মালিক বুঝিতে পারিল, হাঁ, এতদিনে আঘাত-সহ সম্পাদক জুটিয়াছে—ইহাকে আর মারিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু মালিক ছাড়াও তো জগতে লোক আছে। তাহারা গণেশকে এত সহজে ছাড়িবে কেন? সদা সর্বদা নানাবিধ লোক নানারূপ বিরুদ্ধ প্রস্তাব লইয়া তাহার কাছে আসে। গণেশ যে ঘরটিতে বসে, তাহার চারিটি দ্বার। পূর্বদ্বার দিয়া ধর্মঘটকারীগণ যদি প্রবেশ করে, পশ্চিম দ্বার দিয়া ঢোকে ধর্মঘটবিরোধী

মালিকের দল। তাহারা বাহির হইবামাত্র উত্তর দ্বার দিয়া ঢোকে ধর্মঘটের সমর্থকগণ, আর দক্ষিণ দ্বারপথে ধর্মঘটের প্রতিবাদীগণ প্রবেশ করে। যে-কোন পাকা সম্পাদকের এই চতুরঙ্গ আক্রমণে কাতর হইয়া পড়িবার কথা—কিন্তু গণেশের গণ্ডার-সত্তা কিছুমাত্র কাতর হয় না। সে সকলের বক্তব্যই সমান ঔৎসুক্যের সহিত শ্রবণ করে, সকলকেই সে সমান খুশী করিয়া বিদায় দেয় এবং কাহারো স্বপক্ষে কিছু লেখে না। ইহাতে সকলেরই সমান অসন্তুষ্ট হইবার কথা কিন্তু গণেশের অদৃষ্টের বা চামড়ার সৌভাগ্যবশত সকলেই তাহার উপরে সমান খুশি হয়। ক্রমে তাহার সম্পাদক-খ্যাতি এত বিস্তৃত হইল যে তাহার পত্নীর কানেও গিয়া প্রবেশ করিল। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহার পত্নী গণেশের বাড়ীতে আসিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল— '*ওগো, তুমি কি পাষাণ, আমাকে কি একবারের জন্যও খবর দিতে নাই? আমি তোমার সংবাদের জন্য ভূ-ভারতের সর্বত্র খুঁজিয়া মরিয়াছি, আর তুমি এখানে নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ!*' বিজ্ঞ পাঠক ও বিজ্ঞতর পাঠিকা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে গণেশ-পত্নীর একটি বাক্যও সত্য নয়—কারণ বিবাহের অ[illegible] কাল পরেই স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ভীষণতম শত্রু হইয়া পড়ে। একজন দূরে গেলে অপরে সন্ধান করা দূরে থাকুক, পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। কিন্তু মুখে ইহা কেহ স্বীকার করিতে চাহে না। গণেশও মুখে স্বীকার না করিয়া, নিজের দোষ মানিয়া লইয়া পত্নীকে গৃহে গ্রহণ করিল এবং পত্নী পতিপ্রেমের আতিশয্যজাত আগ্রহে তাহার বাক্স ডেস্ক ঘরদ্বারের চাবির

গোছাটি সযত্নে অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া ফেলিল। পতির চাবি সংগ্রহেরই সামাজিক নাম পাতিব্রত্য। যে স্ত্রী যত সত্বর যত কৌশলে পতির চাবি সংগ্রহ করিতে পারে সে তত অধিক সাধ্বী।

দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগের পর গণ্ডার-চর্মা গণেশ সম্পাদক-জীবনে আসিয়া মানবজন্মের চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। গণেশের ধারালো কলমের আঘাতে অন্যান্য কাগজের সম্পাদকগণ ভয়ে তটস্থ—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহাদের আঘাতে গণেশ গণ্ডারবৎ অটল। অন্যান্য কাগজ বলাবলি করে, লোকটা কি গণ্ডার ছিল নাকি? হায় সম্পাদককুল, তোমরা অনেক রহস্যই জানো, কিন্তু সব রহস্য তোমাদের আয়ত্ত নয়! 'ছিল না কি' নিতান্ত বাহুল্য—গণেশ সশরীরে একটি গণ্ডার। গণেশ নিরন্তর প্রার্থনা করে—বিধাতা, আমার চামড়া আরও পুরু করিয়া দাও—আরও, আরও। কিন্তু লোকে যাহাই ভাবুক বিধাতার সাধ্যের একটা সীমা আছে। তাই তিনি গণেশের উপরে বিরক্ত হইয়া গণেশের সম্পাদক-জীবন অবসানের নির্দেশ দিলেন।

এবারে আমি যে ঘটনাটি বলিতে যাইতেছি তাহা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত আকারে পাঠকগণ নিশ্চয় দেখিয়াছেন। কারণ কিছুকাল আগে 'জম্বুদ্বীপ সম্পাদকের অভাবনীয় মৃত্যু-রহস্য' নামে পতাকাসম্বলিত হেড লাইনে তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আসল হত্যাকারীকে ধরিতে না পারিয়া লোকে ইহাকে একটা সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড বলিয়া মনে করিয়াছিল—কিন্তু এমন সাম্প্রদায়িক হত্যা আর ঘটে নাই বলিলেও চলে।

একদিন রাত্রি দশ ঘটিকায় গণেশ যখন একাকী বসিয়া পর

দিনের জন্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতেছে—তখন সারা গায়ে শীতবস্ত্র পরিহিত কে একজন তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। গণেশ মুখ তুলিয়া বলিল—কি চান?

আগন্তুক বলিল—আপনাকেই চাই।

গণেশ শুধাইল—কেন?

আগন্তুক বলিল—নিতান্ত প্রয়োজন।

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল—কোথা হইতে আসিতেছেন?

সে বলিল—আসাম।

গণেশ বলিল—বুঝিয়াছি। Grouping সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বুঝি?

সে বলিল—না।

গণেশ শুধাইল—তবে কি প্রয়োজন?

আগন্তুক বলিল—আপনার চামড়াখানি প্রয়োজন।

গণেশ বলিল—প্রয়োজন হইলেই বা পাইবেন কেন? আমার চলিবে কিরূপে? বিশেষ আপনি কে, তাহা তো এখনো জানিতে পারি নাই।

তখন আগন্তুক গাত্র হইতে শীতবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করতঃ স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বলিল—আমি আসামের অরণ্য-প্রদেশের গণ্ডাররাজ। সরল ভাষায় আমি একটি গণ্ডার।

গণেশ বিস্মিত না হইয়া বলিল—কিন্তু আমার চর্ম্মে কি প্রয়োজন?

আসাম হইতে আগত গণ্ডার বলিল—আমার চামড়াই সব চেয়ে পুরু বলিয়া এত দিন আমার গৌরব ছিল, কিন্তু ওরে রে

পাষণ্ড, তোর সম্পাদক-খ্যাতি প্রচারিত হইবার পরে আমার সমস্ত গৌরব ধূলিসাৎ হইয়াছে। কাজেই তোকে হত্যা করিয়া তোর চামড়াখানা লইতে আমি আসিয়াছি।

গণেশ বলিল—কিন্তু আমাকে মারিলে কি নরহত্যার দায়ে পড়িবে না?

গণ্ডাররাজ গর্জন করিয়া বলিল—নিশ্চয়ই নয়। স্মরণ করিয়া দেখ, তুই পূর্বজন্মে গণ্ডার ছিলি আর এখনো তুই একটা আধ্যাত্মিক গণ্ডার।

গণেশ শান্তভাবে বলিল—আর্কিমিডিসের নাম শুনিয়াছ?

গণ্ডাররাজ বলিল—সে আবার কি?

গণেশ বলিল—সে একটি লোক। ঘাতকের উদ্যত অস্ত্রের তলে বসিয়া সে বলিয়াছিল যে, মারো কিন্তু বৃত্তটি নষ্ট করিও না। সেইরূপ আমিও তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আমাকে মারিতে চাও মারো, কিন্তু এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি নষ্ট করিও না।

গণ্ডাররাজ বলিল—তোর প্রবন্ধের উপরে আমার লোভ নাই। লোভ তোর চামড়াখানার উপরে।

এই বলিয়া সে তীক্ষ্ণ খড়্গের আঘাতে গণেশের দেহ চিরিয়া ফেলিয়া তাহার চামড়াখানি খুলিয়া লইয়া বেশ সযত্নে ভাঁজ করিয়া, ছোট একটি স্যুটকেশে পূরিয়া, পুনরায় শীতবস্ত্রাদি গায়ে জড়াইয়া হেলিতে দুলিতে প্রস্থান করিল। গণেশের চর্মহীন রক্তাক্ত দেহ টেবিলের উপর পড়িল। খানিকটা রক্ত ছুটিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটি ছত্রের নীচে গিয়া পড়িল। সকলে ভাবিল, সম্পাদক ছত্রটিকে লাল কালিতে আণ্ডার-লাইন করিয়া

দিয়াছেন। সেই ছত্রটি তুলিয়া দিয়া আমরা গণ্ডার-জীবনকাহিনীর অবসান করিলাম ঃ

"চর্মের দৃঢ়তাতেই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব।"

ব্রহ্মার হাসি

আমাদের পাড়ার ভুলু সকাল হইতে ভাবিতেছিল আজ সে 'দি হেভেন' সিনেমায় ছবি দেখিতে যাইবে। সেই মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া সে যাত্রাও করিয়াছিল—কিন্তু সিনেমা অবধি পৌঁছিবার আগেই সম্প্রদায়বিশেষের ছুরিকাঘাতে আহত হইয়া সে সোজা স্বর্গে চলিয়া গেল। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এত স্থান থাকিতে ভুলু স্বর্গে গেল কেন? প্রথমতঃ আমরা প্রাচীন কুসংস্কারের বশে ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থান আছে বলিয়া ভাবি, বস্তুতঃ তত স্থান নাই। জগতে তিনটি মাত্র স্থান আছে স্বর্গ, নরক ও সিনেমা! দ্বিতীয়ত, শাস্ত্রে বলিয়াছে 'যাদৃশী ভাবনা যস্য', বাকিটুকু সকলেরই জানা আছে। শাস্ত্র জানিতে আজকাল আর শাস্ত্রজ্ঞ হইবার প্রয়োজন করে না। ভুলুর ভাবনা ছিল 'দি হেভেন'-এর জন্য—কাজেই সে মূল 'হেভেন' অর্থাৎ স্বর্গে চলিয়া গেল। ইহাতে ভুলু খুব যে বেশী খুশী

হইয়াছিল, বলিতে পারি না—কেই বা হয় ?

যাই হোক সে যাত্রাপথের প্রান্তে দেখিতে পাইল প্রাচীর-ঘেরা জেলখানার মত একটা জায়গা, তবে তার দরজা একেবারে উন্মুক্ত। সে সোজা ঢুকিয়া পড়িল। সে দেখিল রাস্তার দুই পাশে বড় বড় সব বাড়ী—তাহাদের গায়ে 'টু লেট' লেখা কাঠের খণ্ড স্বর্গীয় বাতাসে দুলিয়া ঠুক ঠাক শব্দ করিতেছে। ওই শব্দটুকু শুনিয়া ভুলু বুঝিতে পারিল স্থানটার নিস্তব্ধতা কি গভীর। তখন তাহার প্রথম চৈতন্য হইল যে, আশেপাশে কোথাও লোকজন নাই। সে ভাবিল—এ কোথায় আসিলাম ? কলিকাতা শহর নিশ্চয় নয়, সেখানে তো এমন করিয়া 'টু লেট'-এর মাদুলি বাতাসে দোলে না !

কিছুদূর আসিয়া সে দিখিল, একটি বৃদ্ধ বড় একটা গাছের ছায়ায় চারপায়ার উপর আরামে ঘুমাইতেছে। আরও একটু কাছে আসিলে দেখিল, এ কি কাণ্ড ! গাছের ডালে বাঁধা একটি ভাঁড়ের যুগল-রন্ধ্র-নির্গত কি একটা বস্তু ফোঁটা ফোঁটা তাহার দুই নাসারন্ধ্রে পড়িতেছে। একটু হাতে লইয়া শুঁকিয়া দেখিয়া ভুলু বুঝিল উহা আর কিছুই নয়, পৃথিবীতে যাহা সর্ষপ তৈল বলিয়া এক সময়ে বিখ্যাত ছিল, সেই বস্তু। বৃদ্ধের অটোমেটিক নিদ্রা-কৌশল দেখিয়া ভুলু বিস্মিত হইয়া গেল, ভাবিল ইহার পরিচয় না লইয়া যাওয়া হইবে না। নাকে তৈল দিয়া ঘুমানো মনুষ্য-জীবনের আদর্শ। কিন্তু নাকে তৈল নিষেক করিতেও একটু পরিশ্রম করিতে হয়—বৃদ্ধ তাহাও বাতিল করিয়া দিয়াছে। ভুলু মনে মনে বলিতে লাগিল ধন্য

কৌশল, ধন্য প্রতিভা।

ভুলু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না সে কোথায় আসিয়াছে। তখন সে অনেক কৌশল ও অনেক প্রযত্ন করিয়া বৃদ্ধের ঘুম ভাঙাইল। বিরক্ত বৃদ্ধ হইয়া বলিল—বাপু একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম, তা বুঝি পছন্দ হইল না?

ভুলু বলিল--মহাশয়, চটিবেন না। আমি কোথায় আসিয়াছি?

বৃদ্ধ বলিল—এ স্থানের নাম স্বর্গ।

ভুলু পুনরপি শুধাইল—ইহাই কি 'হেভেন?'

বৃদ্ধ বলিল—'হেভেন'ও বলিতে পারো—তবে আমরা স্বর্গ নামটিই পচ্ছন্দ করি।

তখন ভুলু বলিল—কিন্তু ছবি কোথায়? কখন্ ছবি দেখানো হইবে?

বৃদ্ধ বলিল—ছবি আবার কি? যাহা দেখিতেছ তাহাই কি যথেষ্ট নয়?

ভুলু বলিল—আমরা গৌড়বাসী। ছবির পর্দায় কোন বস্তু অনূদিত না দেখিলে আমাদের বোধগম্য হয় না—আমরা জাত-শিল্পী কিনা।

নিদ্রাভঙ্গজনিত বিরক্তিভরে বৃদ্ধ বলিল—ছবি-টবি এখানে নাই। আর থাকিবেই বা কি প্রকারে? লোকজন কি এখানে কেউ আছে? বাড়ী-ঘর সব খালি দেখিতেছ না? আমি একাই আছি।

ভুলু শুধাইল— মহাশয়ের নাম কি?

বৃদ্ধ বলিল—ব্রহ্মা।

ভুলু চমকাইয়া বলিল—কোন্ ব্রহ্মা ?

—ব্রহ্মা আবার কয়জন ? স্থষ্টিকর্তা ব্রহ্মা।

ভুলু তখন পা ছড়াইয়া বসিয়া উচ্চ স্বরে বিলাপ করিতে শুরু করিল—এ কোথায় এনু গো ? এখানে সিনেমা নেই। এর চেয়ে যে সাঁওতাল পরগণার মাঠ অনেক ভালো। ওগো ব্রহ্মা, তুমি আমাকে কল্‌কাতা শহরে রেখে এসো গো।

তারপর সে আরম্ভ করিল—

'তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে !'

ভাবের আবেগে কথাগুলি কিছু উল্টাপাল্টা হইয়া গেল।

ব্রহ্মা শুধাইল—ও আবার কি ?

ভুলু বলিল—আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। খোঁড়া লোক যেমন লাঠি না হইলে চলিতে পারে না, আমরা তেমনি জাতীয় সঙ্গীত ছাড়া বিলাপ করিতে পারি না !

সে আবার আরম্ভ করিল—

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলনিবাসিনী
নমামি তারিণীং

রিপুদল বারিণীং
বহুবল ধারিণীং মাতরং !

ব্রহ্মা মহেন্দ্র সিংহের মতো প্রশ্ন করিল—কে তোমাদের মা ?

গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ভুলু বলিল—সি-নে-মা।

ব্রহ্মা তাহার মাতৃভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে বলিল—ধন্য মাতৃভক্তি। নিজের মাতা নাই মনে করিয়া তাহার ক্ষোভ হইতে লাগিল। প্রকাশ্যে বলিল—ধন্য তোমার মাতৃভক্তি।

ভুলু বলিল—আমরা গৌড়বাসী! আমাদের মারো, কাটো অনশনে রাখো, manhole-এ নিক্ষেপ করো, আমাদের উপর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ চালাও, সমস্ত দেশটাকে 'নোয়াখলি' করিয়া দাও, কিছুতেই আমাদের দুঃখ নহে—কিন্তু সিনেমায় হস্তক্ষেপ করিলে আমরা সহ্য করিব না, কারণ—

'তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।'

সে বলিল—কলিকাতায় এখন সাঁঝবাতি আইন চলিতেছে, তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই—বরঞ্চ লাভ, কারণ অধিকাংশের ঘরে সাঁঝবাতি জ্বালিবার তৈলেরই অভাব—কিন্তু ওই আইনের ফলে সিনেমায় একটা 'শো' বন্ধ হইয়া গিয়াছে—এ দুঃখ তাহারা কোথায় রাখিবে ?

ব্রহ্মা শুধাইল—এখন গৌড়বাসীরা কি করে ?

—কি আর করিবে ? অগত্যা ওই সময়টা তাহারা দেশের বিষয় চিন্তা করিয়া কাটায়।

ব্রহ্মা বলিল—ওই যে নোয়াখালির উল্লেখ করিলে সেখানে যাওনা কেন ?

ভুলু বলিল—সেখানে যে সিনেমা নাই। তারপরে সোৎসাহে শুরু করিল—সেখানে গোটাকতক সিনেমা খুলিয়া দাও, দেখো আমরা যাই কিনা যাই !

—সেখানে কেহই কি যায় নাই ?

—একটা আটাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ গিয়াছে কিন্তু লজ্জার কথা কি আর বলিব, শুনিয়াছি তোমরা অন্তর্যামী, না বলিলেও জানিবে, তাই বলিয়াই ফেলি—সে লোকটা চার্লি চ্যাপলিনের নাম অবধি শোনে নাই।

ব্রহ্মা বলিল—আমিও এই প্রথম শুনিলাম।

ভুলু সরোষে বলিল—তবে তুমিও নোয়াখালি যাও।

তারপরে পুনরায় করুণ বেহাগে আরম্ভ করিল—ওগো, এ কোথায় এনু গো—আমাকে কল্‌কাতায় রেখে এসো।

ব্রহ্মা বিরক্ত হইয়া ভুলুকে এক চড় মারিল! সে শুকনো পাতার মতো উড়িতে উড়িতে কলিকাতায় চলিল। ব্রহ্মা নিজে নোয়াখালি চলিল।

ভুলু হাসপাতালে পাশ ফিরিল। ডাক্তার ব [illegible]ল—এ-যাত্রা বোধ করি বাঁচিয়া উঠিল।

ব্রহ্মা নোয়াখালির চৌমুহানি নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিল।

ব্রহ্মা চৌমুহানি পৌঁছিয়া দেখিল ভারী এক সভা বসিয়াছে। কুম্ভীর খাঁ নামে এক উজীর বক্তৃতা করিতেছে। সে বুক চাপড়াইতেছে আর বলিতেছে—হায়, হায়, এমন কাজ কে

করিল? কে এমন সর্বনাশ করিয়া গেল? আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াছি—কিন্তু আসামীদের খুঁজিয়া পাইলাম না! এ সমস্তই বহিরাগতের কাজ। বাহির হইতে গুণ্ডাদল আসিয়া এই কাজ করিয়া গিয়াছে। এখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় একেবারে নিরাপরাধ—তাই তাহাদের গ্রেপ্তার করি নাই। বিশ্বাস না হয়—দেখিয়া এসো—এখনো তাহারা আগের মতো শান্তভাবে চাষবাস করিতেছে। তোমরা তাহাদের কিছু বলিও না—তাহারা সম্পূর্ণ নির্দোষ।

সে এইভাবে কথা বলিতেছে—আর তাহার চোখ হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে—সেই জলপ্রবাহ খাল বাহিয়া ছুটিয়াছে এবং একটি বৃহৎ কুণ্ডে আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে। সেখানে একদল লোক, বোধ হয় তাহারা বহিরাগত গুণ্ডার দল, ছুরি-ছোরা, তরোয়াল, লোহার দণ্ড প্রভৃতি ধুইতেছে। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র রক্তে লাল। সেই রক্তে কুণ্ডের জল লাল হইয়া উঠিয়াছে। আর একদল সেই রক্তবর্ণ জল শিশি-বোতলে ভরিয়া প্রস্থান করিতেছে। তাহারা হাঁকিয়া বলিতেছে, 'অতি উত্তম রক্তবর্ধক সালসা, মূল্য বোতল প্রতি এক টাকা মাত্র। এই সালসা পান করিলে রক্তাল্প ব্যাধির রক্তবর্ধন হইবে। একেবারে অব্যর্থ। কিনিয়া লও। বিলম্বে ফুরাইয়া যাইবে!'

ব্রহ্মা বুঝিল—ইহাদের তুলনা নাই। সে যে মানুষ না হইয়া নিতান্ত দেবতা হইয়া জন্মাইয়াছে সেজন্য সে দুঃখ অনুভব করিতে লাগিল।

ব্রহ্মা চারিদিকে হাজার হাজার দুর্গতের দেখা পাইল। তাহার

মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ। তাহাদের মধ্যে অনেকের গায়েই আঘাতের চিহ্ন, কিন্তু কাহারো গায়ে বস্ত্রের চিহ্ন নাই। তাহারা শীতে কাঁপিতেছে, ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছে—বলির পশুর মতো তাহাদের মুখে একপ্রকার অসহায় ভীতির ভাব।

ব্রহ্মা আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল সারি সারি তাঁবু পড়িয়াছে—একশতের কাছাকাছি হইবে। সেখানে দলে দলে যুবক-যুবতী নানা বর্ণের 'ব্যাজ' ধারণ করিয়া উপবিষ্ট—সকাল বেলায় তাহারা গ্রামোফোন সঙ্গীত সহকারে চা ও বিস্কুট গলাধঃকরণ করিতেছে। ব্রহ্মাকে দেখিবামাত্র কয়েকজন যুবক-যুবতী ছুটিয়া আসিয়া তাহার ঘাড়ের উপরে পড়িল, বলিল—আমাদের তাঁবুতে এসো। আমাদের Ideology-টা তোমাকে বুঝাইয়া দিই। এই বলিয়া পকেট হইতে একটা ফুটো পয়সা বাহির করিয়া বুঝাইতে লাগিল—বুড়ো, ছোটবেলায় তোমার ঠাকুরমার কাছে নিশ্চয় শুনিয়াছ যে বাসুকির মাথায় পৃথিবী ন্যস্ত! তাহা নিতান্তই ঠাকুরমার উপকথা। পৃথিবী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এই পয়সার উপরে। ইহার নাম 'জগতের আর্থিক ব্যাখ্যা'। তুমি যদি আমাদের ক্যাম্পে আগমন করো—তবে এই সব দুরূহ তত্ত্ব তোমাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিব আর সঙ্গে সঙ্গে একখানি রাশিয়ান কম্বল পাইবে—আর যদি উহাদের ক্যাম্পে যাও, তবে তোমার দুর্গতির অন্ত থাকিবে না, ক্যাপিট্যালিস্টদের চাপে তোমার জীবনান্ত ঘটিবে।

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই চার-পাঁচজন যুবক আসিয়া তাহার হাত ধরিল—এসো, এসো বুড়ো, আমাদের ক্যাম্পে।

একজন তাহার একখানি ছবি তুলিয়া লইল। আর একজন কাগজ-কলম লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল—একটা বিবৃতি দাও। ছবি-শুদ্ধ আমরা ছাপাইয়া দিব।

ব্রহ্মা কিংকর্তব্য স্থির করিবার পূর্বেই আরও পাঁচ সাত দল আসিয়া তীর্থের পাণ্ডার মতো তাহাকে লইয়া টানাটানি শুরু করিয়া দিল। তাহাদের মধ্যে যাহার দৈহিক শক্তি সবচেয়ে বেশী সে ব্রহ্মাকে টানিয়া লইয়া নিজেদের ক্যাম্পে গিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা একখানি ভাঙা চেয়ারের উপরে বসিল। যুবকটি তাহাকে নিজেদের Ideology বুঝাইতে লাগিল।

ব্রহ্মা বলিল—কিছু খাইতে পাইব কি?

যুবকটি বলিল—বৃদ্ধ, তুমি নিতান্তই সাম্রাজ্যবাদী। নতুবা এমন Ideologyর ব্যাখ্যার সময়ে তোমার খাদ্যের কথা মনে পড়ে?

ব্রহ্মা বলিল—কেন বাপু, তোমরা ত বেশ খাইতেছ!

সত্য-সত্যই তাঁবুর এক দিকে বসিয়া কয়েকজন লোক cheese দিয়া পাঁউরুটি খাইতেছিল।

ব্রহ্মা বলিল—Ideologyর চেয়ে এখন কি খাদ্যের প্রয়োজন বেশী নয়?

যুবকটি বলিল— অন্ন, বস্ত্র এবং ঔষধের ব্যবস্থাও আছে।

—কোথায়?

—শ্রীরামপুরে

—কে করিতেছেন?

—তিনি।

—ব্রহ্মা শুধাইল—তাঁহার বয়স কত ?

—আটাত্তর বৎসর।

ব্রহ্মা শুধাইল—তবে তোমরা কি করিতেছ ?

যুবক বলিল—আমরা Ideology প্রচার করিতেছি। তত্ত্ব প্রচার করিবার এমন সুযোগ আর পাইব কোথায় ? দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা এবং সাম্প্রদায়িক অত্যাচার Ideology প্রচারের প্রশস্ততম সময়। অন্য সময়ে লোকে এসব কথায় কান দিতে চায় না, চাষবাস লইয়াই থাকে। এখন তাহারা এসব না শুনিয়া যায় কোথায় ?

—তোমরা জাতির দুর্দশার কথা ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়াই মনে হইতেছে—

যুবকটি সদম্ভে বলিল—কখনোই না। দেখ না আমি কি রকম জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে পারি—এই বলিয়া সে তাল-লয় সংযোগে আরম্ভ করিল—

"সুজলাং সুফলাং মাতরম্
মাতরম্—মা—মা—মা—মা—
আ—আ—আ— চা—চা—চা—চা—"

তাহার চা—চা—আহ্বান শুনিয়া একজন উর্দিপরা আরদালি দ্রুত চা-বিস্কুট লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

যুবকটি চায়ের কাপে মনোনিবেশ করিতেই ব্রহ্মা তাঁবু হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। তাঁবুর সকলে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল—বলিতে লাগিল—গেল গেল লোকটা, বিবৃতি না দিয়াই গেল। কেহ বলিল—লোকটা বোধকরি কুম্ভীর

খা-র চর, কেহ বলিল—সাম্রাজ্যবাদীর লোক। সকলেই বলিল—আজকালকার দিনে কৃতজ্ঞতার একেবারেই অভাব। তখন কৃতঘ্নতার শোক ভুলিবার উদ্দেশ্যে সকলে জাতীয় সঙ্গীত সহযোগে প্রাতঃকালীন দশম পেয়ালা চায়ে মনোনিবেশ করিল। ধাবমান ব্রহ্মার কানে দূর হইতে আসিতেছিল—মা—মা—মা—চা—চা—চা।

ব্রহ্মা ছুটিতে ছুটিতে দেখিতে পাইল চারিদিকে দগ্ধ পল্লীর অবশেষ, নরকঙ্কাল আর নর-করোটি। ব্রহ্মা দেখিল বৃহৎ সব অট্টালিকা অর্ধদগ্ধ—বিপণি ও বাজার লুণ্ঠিত, এমন কি সুপারির বাগানগুলি পর্যন্ত অগ্নিতে ঝলসিত হইয়া দণ্ডায়মান। ব্রহ্মা বুঝিল এ সমস্তই বহিরাগত দুর্বৃত্তের কাণ্ড। ছুটিতে ছুটিতে সে একটি ছোট্ট গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গ্রামটিও বহিরাগতের উপদ্রবে ধর্ষিত। সেখানে ছোট একখানি টিনের চালাঘরে একজন বৃদ্ধকে উপবিষ্ট দেখিল—তাহার নিকটে কয়েকজন মানুষের ভগ্নাবশেষ। চারিদিকের ধ্বংস ও অস্থিরতার মধ্যে বৃদ্ধের অতুলনীয় স্থিরতা ও শান্তি একপ্রকার অপার্থিব মোহ বিস্তার করিয়াছে। তাহার মনে হইল এই বৃদ্ধ কে? [illegible] মস্তক মুণ্ডিত, কটিলগ্ন শুভ্রবাস, নগ্ন গাত্র। হস্তিনাপুরের ধ্বংসের উপরে করুণ সন্ধ্যাতারার মতো তাহার চক্ষু দুইটি অপরিমেয় সান্ত্বনা বিস্তার করিতেছে। ব্রহ্মা তাহার কাছে গিয়া বলিল—আমাকে তোমার Ideology-টা একটু বুঝাইয়া দাও।

বৃদ্ধ তাহাকে দেখিয়া লইয়া একজন সঙ্গীকে বলিল—নির্মলকুমার, এই ভাইকে খাদ্য দাও।

ব্রহ্মা চমকাইয়া উঠিল—এ পর্যন্ত খাদ্যের কথা কেহ তাহাকে বলে নাই—সবাই তত্ত্বের কথা মাত্র বলিয়াছে। বিস্মিত ব্রহ্মা বলিল—একবার জাতীয় সঙ্গীতটা শুনিতে পাই না!

বৃদ্ধ বলিল—এই ভাইকে একখানা কম্বল দাও।

—কম্বল? জাতীয় সঙ্গীত নয়?

তাহার বিস্ময় দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল—দুর্গতের নিকটে অন্ন-বস্ত্ররূপ ব্যতীত ভগবানের অন্য কোন রূপ নাই। ব্রহ্মা আহার সমাধা করিলে ও কম্বল গায়ে দিলে বৃদ্ধ একখানি লাঠি ও একটি পুঁটুলি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ব্রহ্মা দেখিল—বৃদ্ধটি সুপারির গাছের সাঁকো পার হইয়া মাঠ ভাঙিয়া সন্ধ্যার ছায়াঘন দিগন্তের দিকে চলিয়াছে—নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ।

তাহার মনে হইল বৃদ্ধের উন্নত মস্তক আকাশে গিয়া ঠেকি-য়াছে—সমস্ত পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া কেবল সেই দিব্যমূর্তিটি মাত্র আছে—আর কিছুই নাই—আর সবই যেন মায়া। তখন তাহার মনে হইল, সবাই এই বৃদ্ধটির কথাই বলিয়াছিল—সবাই এই একক বৃদ্ধের উপরে সেবার ভার দিয়া Ideology ও জাতীয় সঙ্গীত প্রচার করিতেছে।

ব্রহ্মা হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। বিশ্বসৃষ্টির পর হইতে যে হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছিল—এই সে প্রথম হাসিল। সে হাসির আঘাতে মানস সরোবরে ঢেউ উঠিল, আকাশে তারা ফুটিল, তারায় জ্যোতি ফুটিল, পৃথিবী হরিৎ হইল, আকাশ নীল হইল, স্বর্গচ্যুত দেবতারা আবার স্বর্গে ফিরিয়া অধিষ্ঠিত হইল—মানুষ আবার মনুষ্যত্ব লাভ করিল। ব্রহ্মাণ্ড চটকা ভাঙিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল।

সেই হাসির আঘাতে নির্বাসিত সত্য, সৌন্দর্য, আনন্দ মানুষের অন্তরে পুনঃ স্থাপিত হইল। সেই হাসির দিব্য জ্যোতিতে মানুষ দিব্যদৃষ্টি পাইল। ব্রহ্মার হাসিতে ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইল—মানুষের নবজন্ম লাভ ঘটিল। সেই হাসি বিশ্বে এখনো ধ্বনিত হইতেছে—কবি ও সাধকগণের দিব্যকর্ণ তাহা শুনিতে পায়।

শাপে বর

দেবরাজ ইন্দ্র সুবর্ণখচিত হুঁকার নলে একটি টান দিয়াই খক্ খক্ করিয়া কাশিয়া উঠিলেন। কাশির বেগ প্রশমিত হইলে সরোষে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কে আজ তামাক সাজিয়াছে?

পাশেই প্রধান হুঁকোবর্দার জগবন্ধু দণ্ডায়মান ছিল, সভয়ে সে বলিল—প্রভু, আমি।

—নিশ্চয়ই কিছু গোল হইয়াছে, নতুবা কাশিলাম কেন?

জগবন্ধু বলিল—প্রভু, তামাক সাজিবার দোষ নয়, খুব সম্ভব আপনার গলাতেই দোষ হইয়াছে। একবার দেববৈদ্যকে ডাকিব কি?

এখন, মানবরাজ ও দেবরাজ দুয়েরই এক স্বভাব, মনের

মতো উত্তর না পাইলে চটিয়া যান। যদি জগবন্ধু বলিত যে প্রভু অধমের দোষেই এমন হইয়াছে তবে দেবরাজ হয়তো ক্ষমা করিতেন। কিন্তু বাধা পাইয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, ওরে পাষণ্ড, ইহার সমুচিত দণ্ড তোকে পাইতেই হইবে। আমি অভিশাপ দিতেছি যে তুই মর্ত্যে গিয়া মানব-জন্ম গ্রহণ কর এবং মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া পূজা-সংখ্যা সম্পাদনা করিতে থাক্।

অভিশপ্ত জগবন্ধু কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল, বলিল, প্রভু ক্ষমা করুন।

ইন্দ্র তাহার বিনয়-দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেও ক্ষমা করিতে রাজী হইলেন না। বলিলেন, মুখের অভিশাপ-বাক্য ও ধনুকের তীর একবার নির্গত হইলে আর ফেরে না, কাজেই যাহা বলিয়াছি তাহা হইবেই।

—প্রভু আমার উদ্ধার হইবে কি প্রকারে ?

--সে ব্যবস্থা আমি যথাসময়ে করিব—এখন যা, নরজন্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হ’ গিয়া।

জগবন্ধু বিষণ্ণ হইল, আবার একটা আস্ত সম্পাদক হইতে পারিবে ভাবিয়া একটু খুশীও যে না হইল এমন নয়। এইভাবে হরিষে-বিষাদে স্বর্গত্যাগ করিবার জন্য সে উদ্যত হইল।

(২)

আড়াই লক্ষ রঙিন পোস্টারে কলিকাতা শহর ছাইয়া গিয়াছে। “পূজা সংখ্যা অমরাবতী পড়ুন, পড়ান ; কিনুন, কেনান ; দেখুন, দেখান। চিত্রে, উপন্যাসে, ছোট গল্পে, প্রবন্ধে, নাটিকায়, রম্য-

রচনায়, কথিকায়-কাহিনীতে, সন্দর্ভে-নিবন্ধে—অভাবনীয় সমাবেশ। আর তৎসঙ্গে আছে চলচ্চিত্রের টুকিটাকি ; অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রেম ও প্রণয়ের রঙদার সংবাদ ; খেলা-ধূলার কথা ; কিশোর-কিশোরী ও খোকা-খুকুর গল্প ; রাজনীতির গূঢ় গোপন কেচ্ছা। আর বাঙালী লেখক-লেখিকাদের সকলকেই পাইবেন। এমন কি ঝানু কংগ্রেসী ও কম্যুনিষ্ট লেখকগণও একাসনে উপবিষ্ট। এক কথায় পূজা সংখ্যা অমরাবতী হইতেছে সরস্বতীর ইউনাইটেড ফ্রন্ট। মূল্য সডাক আড়াই টাকা। আজই আপনার অর্ডার বুক করুন, গৌণে হতাশ হইবেন। বিক্রেতা-গণের জন্য বিশেষ সুবিধা ও কমিশনের ব্যবস্থা আছে—অমরাবতী অফিসে সন্ধান করুন। অমরাবতী বিল্ডিংস, কর্মাধ্যক্ষ।"

অমরাবতী পত্রিকার বিজ্ঞাপনী-চিত্রকলা সিনেমার বিজ্ঞাপনকে হার মানাইয়াছে। প্রথমটা তো লোকে ভাবিয়াছিল যে, অমরাবতী কোন নূতন ছবির নামই বা হইবে। ঐ বিজ্ঞাপন পড়িতে গিয়া দৈনিক ১০।১২ জন নরনারী, বালক ও বৃদ্ধ গাড়ী চাপা পড়িতে লাগিল। কিন্তু এহো বাহ্যঃ ! আসল কথা শহরের বিস্ময়ের অন্ত নাই, অমরাবতীর নাম আগে কেহ শোনে নাই, সকলে ভাবিল, কাহার কাগজ, এত টাকা কোথায় পাইল, কাগজের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? অবশেষে সকলে স্থির করিল—আর কিছুই নয়, নেহরু গোয়া-পরিস্থিতি চাকা দিবার উদ্দেশ্যে সাহিত্যিকগণকে হাত করিবার জন্য টাকা ছড়াইতেছে। আবার কেহ সিদ্ধান্ত করিল—নেহরু এত টাকা পাইবে কোথায় ? এ হয় রাশিয়া নয় মার্কিনের কীর্তি। ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব

হয় না তাহারা জানে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্মিত হইল সাহিত্যিক-গণ। তাহারা কখনো অমরাবতী পত্রিকার নাম শোনে নাই কিম্বা অমরাবতী বিল্ডিংস্-ই বা শহরের কোথায় তাহাও জানে না। তাহারা গোপনে টেলিফোন ও স্ট্রীট ডাইরেক্টরী লইয়া বসিল। সকলেই ভাবিল, সকলের আগে গিয়া লেখাটি দিয়া নগদ টাকা বাহির করিয়া আনিতে হইবে।

(৩)

কবিগুরু বলিয়াছেন যে, "কাব্য পড়ে ভাবো যেমন কবি তেমন নয় গো।" এমন সত্যকথা তিনি আর বলেন নাই। বই পড়িয়া প্রেস, কাগজওয়ালা, দপ্তরী, প্রকাশক সকলের বিষয়েই কিছু না কিছু জানিতে পারা যায়, কেবল জানিতে পারা যায় না লেখককে। বৈরাগ্যমূলক উপন্যাসের লেখক যে অগ্রিম টাকা না পাইলে কলম ধরেন না, গণ-দরদী লেখক যে সম্পাদককে ঘটি-বাটি বাঁধা দিতে বাধ্য করেন, দুর্বোধ্য কবিতার কবি যে টাকা চাহিবার বেলায় নিতান্ত সরল ভাষা ব্যবহার করেন—এসব গূঢ় তথ্য সামান্য পাঠকে জানিবে কি প্রকারে ? সাহিত্যিক আড্ডার চাকর যে মাসখানেক পরেই গাঁটকাটা বৃত্তি অবলম্বন করে—এ কথা কে বিশ্বাস করিবে ? ঐ এক মাস কাল সাহিত্যিকগণের আলাপ-আলোচনা শুনিয়া সংসার সম্বন্ধে তাহার যে তত্ত্বজ্ঞান হয়—তাহাতে আগের যুগে হইলে সে ঠগী বা ফাঁসুড়ে হইত, এখন যুগটা নিরামিষ বলিয়া সে আর গলা কাটে না, গাঁট কাটে মাত্র। এক বন্ধুর গল্প ফিল্মে পরিণত হইলে সাহিত্যিকগণ সাগ্রহে

প্রতীক্ষা করিয়া থাকে কবে ছবিটা মার খাইবে। নাঃ চল্‌ল না, *flop*, বলিতে সকলের মুখেচোখে কি চাপা আনন্দ! আবার কাহারো ছবি জনপ্রিয় হইলে সকলের মুখচোখ কালো হইয়া যায়। কেহই যে কিছু লিখিতে পারে না, এখনো কলম ধরিতেই যে শেখে নাই, কেবল ভাগ্যের বা মুরুব্বির জোরে, কিম্বা মলাট ও বাঁধাইয়ের জোরে করিয়া খাইতেছে—ইহা সত্যই তাহারা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করে। এ হেন সাহিত্যিকদের লইয়া জগবন্ধু অমরাবতী পত্রিকার পূজা সংখ্যা বাহির করিতে উদ্যত। আশা করি, পাঠক ইতিমধ্যেই জগবন্ধুকে ভুলিয়া যান নাই, সে ইন্দ্রের শাপগ্রস্ত হুঁকোবর্দার। মানব-জন্মেও তাহার ঐ নামটি রাখা হইয়াছে, মানবরূপী জগবন্ধুর কোন হাত ছিল না।

(৪)

সহজাত বুদ্ধির বলে জগবন্ধু অনায়াসে বুঝিয়া ফেলিল যে, মাসিক পত্র সম্পাদনা করিবার জন্যই সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইতিপূর্বে আট দশ বার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ফেল করিয়া উক্ত কাজের জন্য সে নিজেকে 'কোয়ালিফাই' করিয়া লইয়াছিল। সে স্থির করিল এমন একখানা পত্রিকা বাহির করিবে যাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং সরস্বতী তাঁহার শতদল পরিত্যাগ করিয়া উক্ত পত্রিকার প্রবন্ধের উপর স্থায়ী হইয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন। একখানা বিজ্ঞাপনে পড়িয়াছিল—'এছা কাম সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরমে কোই নেই কিয়া হ্যায়।' জগবন্ধু স্থির করিল সে-ও অনুরূপ কাণ্ড করিবে। কিন্তু টাকা কোথায়? সরস্বতীর

কাজেও যে লক্ষ্মীর সহযোগিতা আবশ্যক।

তখন সে এক অভিজ্ঞ জ্যোতিষীর কাছে গিয়া এমন এক-খানা, আদর্শ কোষ্ঠী তৈরী করাইয়া লইল যাহার ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সুখ-সৌভাগ্য, পৈত্রিক অর্থ, লটারির টাকা, গুপ্তধন, অভাবিত সম্পত্তি, ব্যবসায় জাত অর্থ প্রভৃতি বাসা বাঁধিয়াছে। তারপরে সেই কোষ্ঠীখানা জ্যোতিষে বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান এক মহাজনের কাছে বাঁধা দিয়া প্রচুর টাকা সংগ্রহ করিয়া ফেলিল।

তারপরে সে ঐ কোষ্ঠীর আর এক কপি এক বড় প্রেস ম্যানেজারকে দেখাইয়া বলিল, দেখছেন তো সৌভাগ্যের দৌড়! আসুন, আমার সঙ্গে পা বাঁধিয়া "থ্রি-লেগেড্ রেসে" নেমে পড়ুন, যা লাভ হবে, আধাআধি ভাগ। ম্যানেজার অনেক টাকা করিয়াছিল, কাজেই তাহার আরো টাকার প্রয়োজন, তাই সহজেই সে রাজী হইল। তারপরে কাগজওয়ালাকে ঐভাবে জগবন্ধু রাজী করিয়া ফেলিল এবং সর্ব্বশেষে লেখকগণের দ্বারস্থ হইয়া দেখিল, কি আশ্চর্য! প্রত্যেকেই আর সকলের চেয়ে ভালো রচনাটি সামনে অমরাবতীর জন্য সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। সকল লেখকের কাছ হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনাগুলি সে সংগ্রহ করিয়া ফেলিল এবং অবশেষে প্রেস, কাগজওয়ালা, দপ্তরীর সহযোগিতায় পূজা সংখ্যা 'অমরাবতী' মহালয়ার পূর্ব্বদিন কলি-কাতা শহরে আত্মপ্রকাশ করিল।

সেদিন ঐ উপলক্ষ্যে শহরে কি কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহা এক-খানি বিখ্যাত সংবাদপত্রের নিজস্ব উক্তি হইতে জানিতে পারা যাইবে। উক্ত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—"অমরাবতী প্রকাশ

উপলক্ষে কলেজ স্ট্রীটের ট্রাম-বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, জনতার ঠেলাঠেলিতে আড়াইশ লোক হতাহত হইয়াছে আর নিরুপায় পুলিশ লাঠিচার্জ করিতে বাধ্য হইয়াছে (এখানে লাঠিচার্জের ছবি আছে)। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, দেড়-লক্ষ 'অমরাবতী' দেড়ঘণ্টায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আরো জানিতে পারিয়াছি, অন্যান্য প্রসিদ্ধ কাগজের একখানিও বিক্রয় হয় নাই (কেবল আমাদের কাগজখানি ছাড়া)। এরূপ সাহিত্যের ঘোড়দৌড় বাংলা দেশে এই প্রথম।"

মহাজন, প্রেস ম্যানেজার প্রভৃতি জগবন্ধুর কাছে টাকা চাহিলে জগবন্ধু সাফ জবাব দিল, আদালতে নালিশ করুন। তাহারা নালিশ করিল, আদালত মামলা ডিসমিস করিয়া দিয়া মন্তব্য করিল, কোষ্ঠী বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার দিলে সে টাকা আদায় করিয়া দিবার ভার আদালত লইতে পারে না। পাওনা-দারগণ অন্য উপায় অবলম্বন করুক।

পাওনাদারগণের অন্য উপায় জানা না থাকায় তাহারা নিরস্ত হইল। আর তখন জগবন্ধু মনের আনন্দে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা কিনিয়া ফেলিল, নাম দিল "অমরাবতী ভবন"।

(৫)

এখন জগবন্ধু মস্ত লোক। কিছুদিন আগে পূজা সংখ্যা অমরাবতীর সুবাদে সে রবীন্দ্র পুরস্কার পাইয়াছে। তাহার বৈঠক-খানায় নিত্যনিয়মিত সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও শহরের অন্যান্য মস্ত লোকেরা আসিয়া সার দিয়া বসেন, মধ্যস্থলে উপবিষ্ট জগবন্ধু

সকলের প্রতি হাসির কৃপাবৃষ্টি করিতে থাকে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা একাকী জগবন্ধু বসিয়া আছে, এমন সময়ে এক ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন।

জগবন্ধু শুধাইল—কা'কে চাই?

—তোমাকেই।

—তুমি কে হে? ভদ্রলোককে 'তুমি' বলছ কেন?

—চিনতে পারছ না জগবন্ধু, আমি ইন্দ্র?

—ইন্দ্র? কোন্ ইন্দ্র? ইন্দ্রসিং, পেট্রোলওয়ালা?

—আমি দেবরাজ ইন্দ্র।

—ওঃ সোবহাজ ঝড়মলের ভাই?

—না, না, দেবরাজ গো, স্বর্গের রাজা, যার হুঁকোবর্দার তুমি ছিলে!

এবারে জগবন্ধুর মনে পূর্ব-স্মৃতি উদিত হইল। সে ব্যস্তসমস্ত ভাবে বলিল, বস্থন, বস্থন, তা স্যার কি মনে ক'রে?

—তোমার মর্ত্যবাসের কাল গত হ'য়েছে, এবারে ফিরে চলো।

জগবন্ধু বলিল, ঐটে পারবো না, অন্য কিছু হুকুম করুন।

—পারবে না কেন? স্বর্গে যাওয়ার জন্য কত লোক উমেদারি করছে জানো?

—জানি, কিন্তু তারা তো অমরাবতীর সম্পাদক নয়!

—এখানে এমন কি আকর্ষণ?

—অন্য সব কথা ছেড়ে দিন, দেখুন না কেন রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছি, আবার শুনছি আকাদামী পুরস্কারটাও জুটে যাবে।

—কবে তক্ ফিরবে ?

—যতদিন পূজা সংখ্যা এদেশে চলবে ততদিন স্বর্গের চেয়ে মর্ত্যই বেশী লোভনীয়।

—কতদিন পরে আবার আসবো ?

—যাক্-না বছর কতক !

—আচ্ছা তবে এখন উঠি।

—তামাক হুকুম করবো নাকি ? আমার হুঁকোবরদার খুব এক্সপার্ট, কাশতে হবে না।

—না, তার দরকার নেই—বলিয়া দেবরাজ বিদায় লইলেন।

জগবন্ধুর শাপে বর হইয়াছে।

এই অলৌকিক কাহিনী একটি নীতিমূলক গল্প। সে নীতিটি হইতেছে, সময়বিশেষে স্বর্গের চেয়ে মর্ত্য মানে বাংলা দেশ অধিকতর সুখের স্থান এবং সেই সুখের চরম পূজা সংখ্যার সম্পাদক-পদ।

শেষ